আমাদের পৃথিবী

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণির ‘পরিবেশ ও ভূগোল’ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকটির নাম ‘আমাদের পৃথিবী’। অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষায় বইটিতে পরিবেশ আর মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা অভিমুখ আলোচিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯– এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণির ‘আমাদের পৃথিবী’ বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্যভার যাতে শিক্ষার্থীকে উদ্বিগ্ন না করে সে বিষয়ে বইটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, সারণি, তালিকা ব্যবহার করে ভূগোলের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো হয়েছে। আশা করি, রঙে রূপে চিত্তাকর্ষক এই বইটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

‘আমাদের পৃথিবী’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ ও ভূগোল' পর্যায়ভুক্ত বইগুলির মধ্যে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমাদের পৃথিবী' প্রকাশিত হলো। এই পাঠ্যপুস্তকে 'ভূগোল' বিষয়টিকে মানবজীবন আর তার পরিবেশের নিরিখে পরিবেশন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চেনা গণ্ডি অর্থাৎ তার বাড়ি, স্কুল, চারপাশের জগৎ থেকে ক্রমে ব্যাপ্ততর ভৌগোলিক ধারণার মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নানা ধরনের হাতেকলমে কর্মচর্চার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীর কাছে ভূগোলের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। নানান সরল মানচিত্র, বৈচিত্র্যে ভরা ছবি, ধারণা গঠনের লেখচিত্র, তথ্যমৌচাক প্রভৃতি অভিনব শিখন সম্ভারে বইটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (CCE) নানা ক্ষেত্র বইটিতে বিদ্যমান। সেসব সমীক্ষা আর সক্রিয়তা উত্তেজনা আর আনন্দে ভরপুর। আশা করি, ভূগোলের ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে এইভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নির্ভর হবে। তাদের ব্যাখা করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটির ব্যবহার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রস্তাবও মুদ্রিত হলো।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রুবি সরকার অপর্ণা বেরা রায়চৌধুরী শান্তনু প্রসাদ মণ্ডল

সৌমেন কর্মকার বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

পরামর্শ ও সহায়তা

গিয়াসুদ্দিন সিদ্দিক কল্যাণ রুদ্র

উত্তম মুখোপাধ্যায় অবন্তী রাউত

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ সহায়তা: বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

প্রাকৃতিক ভূগোল

১। পৃথিবীর পরিক্রমণ (১)

২। ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় (১৯)

৩। বায়ুচাপ (২৯)

৪। ভূমিরূপ (৩৭)

৫। নদী (৪৭)

৬। শিলা ও মাটি (৬১)

পরিবেশ ও মানুষ

৭। জলদূষণ (৬৭)

৮। মাটিদূষণ (৭৭)

আঞ্চলিক ভূগোল

৯। এশিয়া মহাদেশ (৮৩)

১০। আফ্রিকা মহাদেশ (১০০)

১১। ইউরোপ মহাদেশ (১২১)

১ পৃথিবীর পরিক্রমণ

একটা বল হাতে নিয়ে ছেড়ে দিলে কী হবে?

—ঠিক ধরেছো। বলটা মাটিতে পড়ে যাবে। কারণ? পৃথিবীর ওপরে থাকা যে কোনো বস্তুকে পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। এই জন্যেই তো আমরাও পৃথিবী থেকে ছিটকে যাই না,পৃথিবীর ওপরই থাকি। পৃথিবীর এই আকর্ষণ বল হলো _____।

ভেবে দেখেছ?

পৃথিবীও তো একটা ভারী গোলক। পৃথিবীও যদি ওই বলটার মতো পড়ে যায়, তাহলে আমাদের কি হবে? পৃথিবী তাহলে কার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে?

● ভেবে দেখো, ভারী, হালকা সব জিনিসই -'নীচের দিকে' পড়ে, তাইতো?

কিন্তু 'নীচের দিক' কোনটা?

● চারজনই বলবে যে,তার বলটা নীচের দিকে পড়ছে। এই 'নীচের দিক' হতে পারে নীচ থেকে, পাশ থেকে, ওপর থেকে — সবদিক থেকে!

কী কাণ্ড!!

ওপর থেকে কোনো জিনিস পৃথিবীর আকর্ষণের টানে নীচের দিকে পড়ে। তাহলে মহাশূন্যে কী হয়? মহাকাশেও কি আকর্ষণ কাজ করে?

● আসলে সব বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, বা নিজের দিকে টানে। এটা হলো **মহাকর্ষ**। এই টানাটানির খেলায়, যার 'ভর' বেশি, আর যে যত কাছে থাকে, তার আকর্ষণ তত বেশি হয়।

তাহলে কী হবে?

● পৃথিবী তাহলে কার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে? তারার দিকে? তারারা তো অনেক দূরে আছে। তাহলে সূর্যের দিকে?—হ্যাঁ, সূর্য সবথেকে কাছের তারা,আর পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তাহলে পৃথিবী কি সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে? কিন্তু সূর্য যে জ্বলন্ত আগুনের গোলা!

বুঝেই দেখো ব্যাপারখানা

- খুঁটির মাথায় ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরে দৌড়ানোর এক রকম খেলা আছে। খেলেছো কখনো? অথবা, মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়েছো?

- খুঁটি থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি পা দুটো মাটি থেকে তুলে, খুঁটিতে বাঁধা দড়িটা ধরে ঝুলতে চেষ্টা করো, তাহলে কী হবে?

—সোজা ছিটকে গিয়ে পড়বে খুঁটির গায়ে।

- কিন্তু যদি দড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে একপাশে সরে গিয়ে, তারপর পা দুটো মাটি থেকে তুলে দাও, তাহলে?

—এবার খুঁটির চারিদিকে বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকবে!

- মহাকাশেও অনেকটা এইরকম ঘটে। সূর্য হলো খুঁটি, আর তুমি পৃথিবী। পৃথিবী যদি এক জায়গায় স্থির থাকতো, তাহলে সূর্যের টানে সোজা গিয়ে পড়ত সূর্যের ওপর। কিন্তু সৃষ্টির সময়েই পৃথিবী সূর্য থেকে কিছুটা দূরে সরে যায়। আর তারপর থেকে **কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে**। মহাকর্ষের নিয়ম মেনে, এইভাবেই চাঁদও ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। আর সূর্য? সূর্যও তার সৌরজগতের সব গ্রহ, উপগ্রহ সমেত আমাদের ছায়াপথ 'আকাশগঙ্গার' কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে!

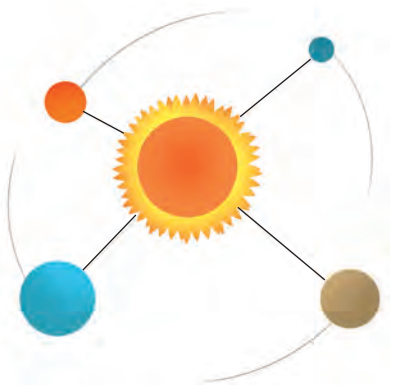

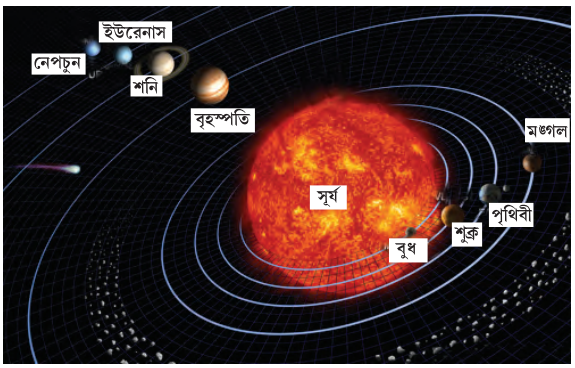

● পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি

পৃথিবী শুধুই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে না। লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে ঘোরে। নিজের 'অক্ষের' চারিদিকে একপাক ঘুরতে বা আবর্তন করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। যে কল্পিত রেখার চারিদিকে পৃথিবী আবর্তন করে, সেটাই **পৃথিবীর অক্ষ (Earth's Axis)**।

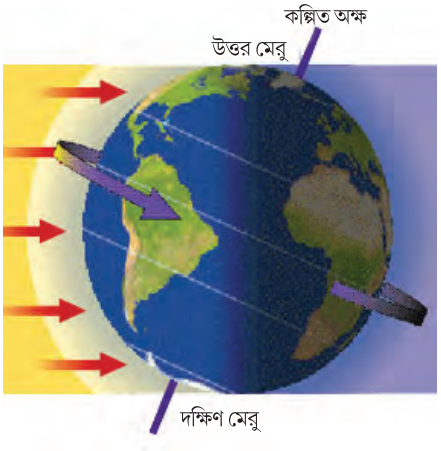

পৃথিবীর যে দুটি প্রান্তে এই কল্পিত অক্ষদণ্ডটি বেরিয়ে থাকার কথা, সেই প্রান্তদুটি হলো **মেরু**। ওপরের প্রান্তটা উত্তর মেরু, আর নীচেরটা দক্ষিণ মেরু। আর দুই মেরুবিন্দু থেকে সমান দূরে, পৃথিবীর মাঝ বরাবর পৃথিবীর বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত। আমাদের দেশ রয়েছে নিরক্ষবৃত্ত এবং উত্তর মেরুর মাঝের অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করতে করতে, নির্দিষ্ট **উপবৃত্তাকার কক্ষপথে** পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) নির্দিষ্ট সময়ে (প্রায় ৩৬৫ দিন) সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা পরিক্রমণ করে। এটাই পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি। বার্ষিকগতি বা পরিক্রমণ গতির বেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিমি।

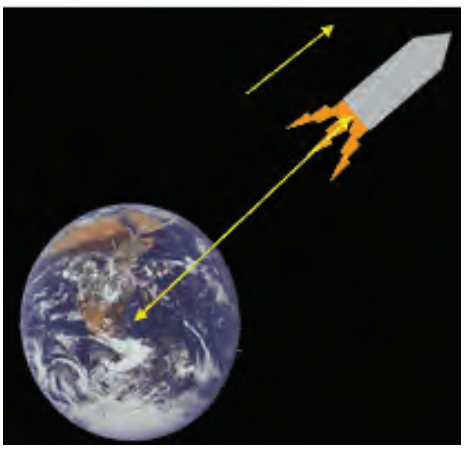

জানো কী?

কোনো বস্তুকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে বস্তুটা কিছুটা ওপরে উঠেও মাধ্যাকর্ষণ-এর টানে নীচের দিকে পড়ে যায়।

কিন্তু সব সময় তা নাও হতে পারে। অনেক বেশি জোরে ছুঁড়লে, অর্থাৎ বস্তুর গতিবেগ খুব বেশি হলে, তা পৃথিবীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কাটিয়ে বাইরে চলে যেতে পারে। কোনো বস্তুকে প্রতি সেকেন্ডে ১১.২ কিমি গতিবেগে ওপরের দিকে ছুঁড়তে পারলে [একে বলে **'মুক্তিবেগ' (Escape Velocity)**] সেটা আর নীচের দিকে না পড়ে, মহাশূন্যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকবে। রকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয় এই মুক্তিবেগে।

পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটা কীরকম দেখতে?

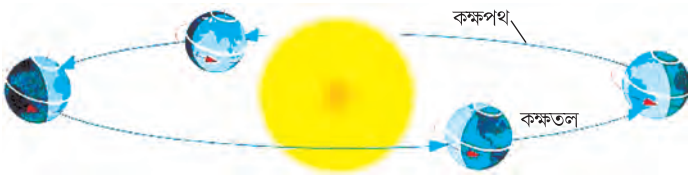

পৃথিবী প্রায় ১৫ কোটি কিমি দূর থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী যে পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেটাই পৃথিবীর **'কক্ষপথ'**। এই কক্ষপথ মহাশূন্যে যে কাল্পনিক সমতলে অবস্থিত, সেটাই **'কক্ষতল'**।

জানলে ক্ষতি কী?

- বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের সময় থেকেই জানা যায়— বিভিন্ন গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। কিন্তু গ্রহগুলো ঠিক কীভাবে ঘোরে— এই সম্পর্কে বিজ্ঞানী কেপলার প্রথম গ্রহদের গতি সংক্রান্ত তিনটি সূত্র প্রণয়ন করেন।
- কেপলারের প্রথম সূত্রে বলা আছে—

" প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য ওই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকে।"

- পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটা অনেকটা গোলাকার। তার সঙ্গে বৃত্তের পার্থক্য এতই সামান্য যে, কক্ষপথটা প্রায় বৃত্তের মতোই।

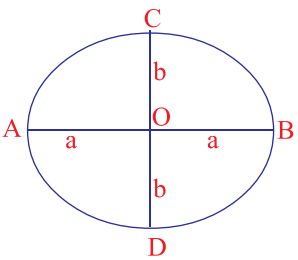

- একটা উপবৃত্তের দুটো অক্ষ। বড়ো অক্ষ (AB), আর ছোটো অক্ষ (CD)। কেন্দ্রবিন্দু 'O'।

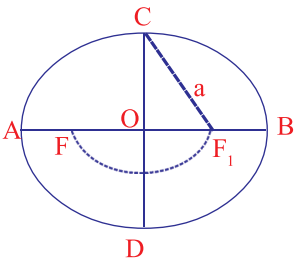

- উপবৃত্তের কেন্দ্রের দু-পাশে, সমান দূরত্বে বড়ো অক্ষের ওপর দুটো **ফোকাস** বিন্দু থাকে। (F, F_1)

- **কিন্তু এই 'উপবৃত্ত' কীরকম হয়? 'বৃত্তের' সঙ্গে তার কতখানি পার্থক্য?**

এঁকেই দেখো!

একটা পেনসিল, দুটো পিন, আর একটু সুতো লাগবে। সুতোর দুটো মুখে গিঁট দিয়ে লুপের মতো বানাও।

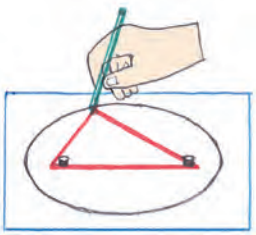

প্রথমে একটা কাগজের ওপর পিন দুটো ছবির মতো করে আটকাও। এবার সুতোর লুপটাকে কাগজের উপর এমনভাবে রাখো, যাতে লুপটা পিন দুটোকে ঘিরে থাকে। এবার লুপটার ভিতরের দিকে পেনসিলটা বসিয়ে লুপটাকে টানটান রেখে কাগজের ওপর দিয়ে একপাক ঘুরিয়ে দাগ টেনে দেখো। কেমন লম্বাটে বৃত্ত হলো! এটাই উপবৃত্ত।

- দুটো পিনকে কাছাকছি বা দূরে আটকে দিয়ে একইভাবে এঁকে দেখতে পারো। অনেকরকম উপবৃত্ত পাবে। কোনোটা ডিম্বাকার, কোনোটা খুব চ্যাপ্টা, লম্বা।

⇦ লক্ষ করে দেখো, কখন প্রায় **বৃত্তাকার** বা **গোলাকার** উপবৃত্ত হচ্ছে।

- উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটা **ফোকাসে** সূর্য অবস্থান করে। একারণে পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে না। একসময়ে পৃথিবী সূর্যের বেশি কাছে আসে আবার একসময় দূরে চলে যায়।

❐ কখন আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি?

- জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পৃথিবী সূর্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে।
- ৪ জুলাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় (প্রায় **১৫ কোটি ২০ লক্ষ** কিমি)। একে পৃথিবীর **অপসূর অবস্থান (Aphelion)** বলা হয়। আবার জুলাই থেকে বাকি ছমাসে দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকে।
- ৩ জানুয়ারি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম হয় (প্রায় **১৪ কোটি ৭০ লক্ষ** কিমি)। একে পৃথিবীর **অনুসূর অবস্থান (Perihelion)** বলা হয়।

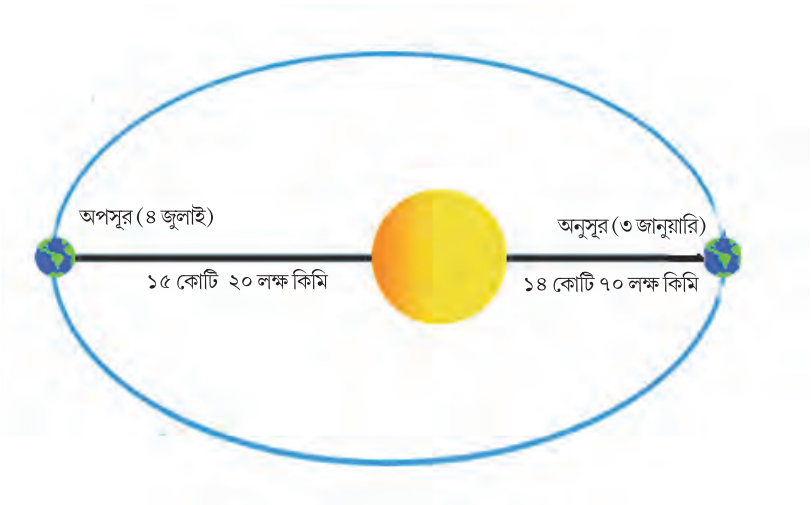

টিক্ টিক্ টিক্— সময় মাপো ঠিক!

সূর্যঘড়ি

ঢং ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল! পরের দিন আবার ঠিক সময়ে স্কুল শুরু হবে, আর ঘণ্টা পড়ার আগে স্কুলে পৌঁছোতে হবে।

- ঘড়ি না থাকলে, সময়কে মাপার কোনো উপায় না থাকলে কি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছোতে পারবে?
- ঘড়ি থেকে তো কটা বাজে জানা যায়। কিন্তু কত তারিখ, কোন মাস, কোন বছর কীভাবে জানা যায়? ঠিক ধরেছ, ক্যালেন্ডার! এই ক্যালেন্ডারে তারিখ, মাস, বছর সব ঠিক ঠিক কী করে লেখা থাকে ভেবে দেখেছ?

প্রাকৃতিক ঘড়ি

সময়কে মাপার তিনটে প্রাকৃতিক উপায় আছে।

প্রথম উপায়টা খুব সহজ। ২৪ ঘণ্টায় একবার করে দিন এবং রাতের পর্যায়ক্রম।

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে কখনও সূর্য থেকে আমাদের আড়াল করে। আবার কখনও নিয়ে আসে সূর্যের আলোর দিকে। আসলে বিশাল একটা জাহাজের মতো পৃথিবীটা সূর্য কিরণের নীচে ধীরে ধীরে ঘুরছে। পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে, সেদিকে হয় দিন, বাকি অর্ধেকটায় তখন রাতের অন্ধকার।

দ্বিতীয় উপায়--- পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীকে প্রায় ২৮ দিনে প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টাকে **'চান্দ্রমাস'** বলে। বর্তমানে ৩০ দিনে একমাস ধরা হলেও, কখনও ৩১ দিনে আবার ২৮ দিনেও একটা মাস হয়।

তৃতীয় উপায়টা — পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণ। পৃথিবী সূর্যকে প্রায় ৩৬৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়টাকে **'সৌর বছর'** ধরা হয়। পরিক্রমণ গতির সময়কে ধরে বছর গণনা করা হয় বলেই একে 'বার্ষিক গতি'ও বলা হয়।

জানো কী?

সভ্যতার শুরু থেকে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এভাবেই দিন রাতের আসা যাওয়া, চাঁদের বাড়া-কমা প্রভৃতি দেখে সময়ের হিসাব রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আরও বেশি নিখুঁতভাবে সময় মাপার প্রয়োজন হলো। ২৪ ঘণ্টার দিনকে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে ভাগ করা হলো। এখন ঘড়ি দেখে অনায়াসে বলে দিতে পারো এই সময় কটা বেজে কত মিনিট, কত সেকেন্ড হয়েছে।

সূর্যঘড়ি বানিয়ে ফেলো

সমতল জায়গায় একটা সাদা কাগজ মাটিতে বিছিয়ে রাখো। একটা লম্বা লাঠি কাগজের মাঝখানে খাড়া করে পুঁতে দাও। এবার একটা রোদের দিনে সূর্য ওঠার ঠিক পরে লাঠির ছায়াটাকে দেখো। পেনসিল দিয়ে ছায়া বরাবর দাগ টেনে ফেলো। সূর্যাস্ত পর্যন্ত একঘণ্টা পর পর ছায়া বরাবর দাগ টেনে যাও। দাগগুলোর পাশে পাশে ঘড়ি দেখে সময়টাও লিখে রাখো। দিনের যেকোনো সময়ে ঐ সূর্যঘড়িটা দেখেই তুমি সময় বলে দিতে পারবে!

- লক্ষ করে দেখো কখন লাঠির ছায়াটা সবথেকে ছোটো হয়?—(সকালে/দুপুরে/বিকেলে)
- কখন সবথেকে লম্বা হয়?—(সকালে/দুপুরে/বিকেলে)

বলো দেখি?

- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবী কতবার নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করে?
- কত মিনিটে ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা হয়?

সূত্র: ১ ঘণ্টায় ৬০ মিনিট আর ১ মিনিটে ৬০ সেকেন্ড হয়।

FEB
29

খেয়াল করেছ?

২৯ ফেব্রুয়ারি— তারিখটা কি প্রতিবছর ক্যালেন্ডারে পাও?
কিন্তু কোনো কোনো বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনে হয়।
তাহলে ২৯ ফেব্রুয়ারি কারো জন্মদিন হলে কী হবে?

জানো কী?

কাদের মাথায় অধিবর্ষের ব্যাপারটা প্রথম এল?
মিশরীয়রা প্রথম একটা অতিরিক্ত দিন যোগ করে হিসাব ঠিক রাখার উপায় আবিষ্কার করে!

কেন এমন হয়?

আমাদের ক্যালেন্ডারের এক বছর (৩৬৫ দিন) আর পৃথিবীর একবার সূর্য পরিক্রমণের সময় (এক 'সৌর বছর' ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড) একই হওয়া উচিত। কিন্তু হিসাবের সুবিধার জন্য ৩৬৫ দিনে একবছর ধরা হয়। ফলে প্রতিবছর এই ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় বাড়তি থেকে যায়। এই বাড়তি সময়ের হিসাব ঠিক রাখার জন্য প্রতি চার বছর অন্তর একটা পুরো দিন (২৪ঘণ্টা) যোগ করা হয় ক্যালেন্ডারে। ঐ একদিন ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে যোগ হয়ে মাসটা ২৯ দিনের, আর বছরটা ৩৬৬ দিনের হয়। ৩৬৬ দিনের বছরকে বলে **অধিবর্ষ (Leap year)**।

কী করে বুঝবে?

যে সমস্ত বছরকে (যেমন ২০১২ সাল) '৪' দিয়ে ভাগ করলে, ভাগশেষ থাকবে না, সেই বছরগুলো 'অধিবর্ষ' হবে। কিন্তু আরও একটা ব্যাপার আছে। চার বছর অন্তর পুরো একটা অতিরিক্ত দিন ধরে নিতে থাকলে কিছু সময় বেশি ধরে নেওয়া হয়। এই সমস্যা মেটাতে শতাব্দী বছরগুলোর (যেমন ১৯০০ সাল, ২০০০ সাল) জন্য অধিবর্ষের নিয়মটা একটু আলাদা করা হয়েছে। শতাব্দী বছরগুলোকে '৪০০' দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ না থাকলে তবেই সেই বছর 'অধিবর্ষ' হবে।

এ তো খুব সহজ!
ঠিক ঠিক লিখে ফেলো

সাল	অধিবর্ষ হবে?
২০০৪	_____
২০০০	_____
২০১২	_____
১৯০০	_____
২০১৩	_____
২১০০	_____

● স্কুল থেকে ফেরার পথে সেদিন পিন্টু আর আলি একটা কাগজের ঠোঙার বল বানিয়ে খেলছিল। খেলতে খেলতে হঠাৎ আলির চোখে পড়ল— বল-এর কাগজে সুন্দর একটা ছবি আর কী সব লেখা। ... কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা হবে হয়তো।

এটুকু পড়েই আলির মাথায় একটা প্রশ্ন এল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে একই পরিমাণে আলো আর তাপ এসে পৌঁছোয়। তবে তো রোজই একই রকম গরম বা একইরকম ঠান্ডা পড়ার কথা। কিন্তু সারাবছর ধরে কখনো 'গরম', কখনো 'ঠান্ডা' এরকম হয় কেন?

সূর্য, পৃথিবীতে জীবনের উৎস। সূর্যের আলো, উত্তাপ ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হয় না, গাছপালা পল্লবিত হয় না। সমস্ত জীব জগৎ সূর্যের ওপর নির্ভরশীল।

সূর্যে প্রতিমুহূর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বিপুল শক্তি তৈরি হচ্ছে। এই শক্তির ২০০ কোটিভাগের ১ ভাগ আলো এবং উত্তাপরূপে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোচ্ছে।

● আলির প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজতে হবে তো!

● **গ্রীষ্ম কেন শীতের থেকে গরম?**

পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর অক্ষটা কিন্তু পৃথিবীর কক্ষপথের সাপেক্ষে পুরোপুরি লম্ব নয়, কিছুটা হেলানো (কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণে অবস্থিত)। তাই পৃথিবীও কিছুটা হেলানোভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে কক্ষপথের এক একটা জায়গায় পৃথিবীর এক একটা গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে।

কেন হেলানো?

পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের কারণেই পৃথিবীর অক্ষের এই হেলানো অবস্থান--- এমনটাই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বুঝে দেখো

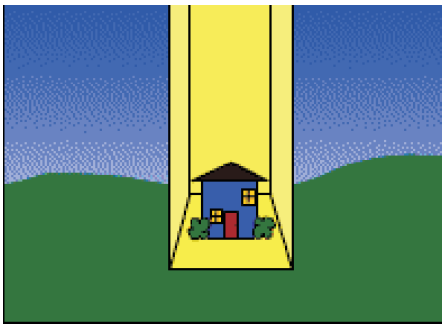

সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়লে তা কম জায়গাকে অনেক বেশি উত্তপ্ত করে।

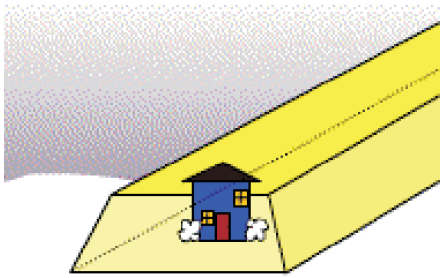

সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়লে বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কম উত্তপ্ত করে।

ভেবে দেখেছো?

- এক বালতি জল দুপুর রোদে আধঘণ্টা রেখে দিলেই গরম হয়ে যায়!!
- **বলো তো, দিনের কোন সময়টা বেশি গরম লাগে?**

→ সকালে সূর্য ওঠার সময়? ☐

→ দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থাকে ? ☐

→ সন্ধ্যায়- সূর্যাস্তের সময়? ☐

→ রাতে- সূর্যাস্তের পর? ☐

পরীক্ষা করে দেখো

একটা অন্ধকার ঘরে টেবিলের ওপর বা সমতল মেঝের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখতে হবে।
প্রথমে টর্চটা টেবিলের ১-২ ফুট ওপরে লম্বভাবে ধরে লক্ষ করো—
টেবিলের ওপর যে আলোর বৃত্তটা তৈরি হয়েছে, সেটা কতটা জায়গা জুড়ে আছে?
আর দেখো আলোটা কতটা উজ্জ্বল?
এবার টর্চটাকে একই উচ্চতায় রেখে একটু হেলিয়ে ধরো।
দেখোতো এবার আলোকিত জায়গাটা বাড়ল কিনা?
আর আলোটা আগের থেকে বেশি জোরালো না হালকা হলো?

ঋতুগুলো কেন আসে ?

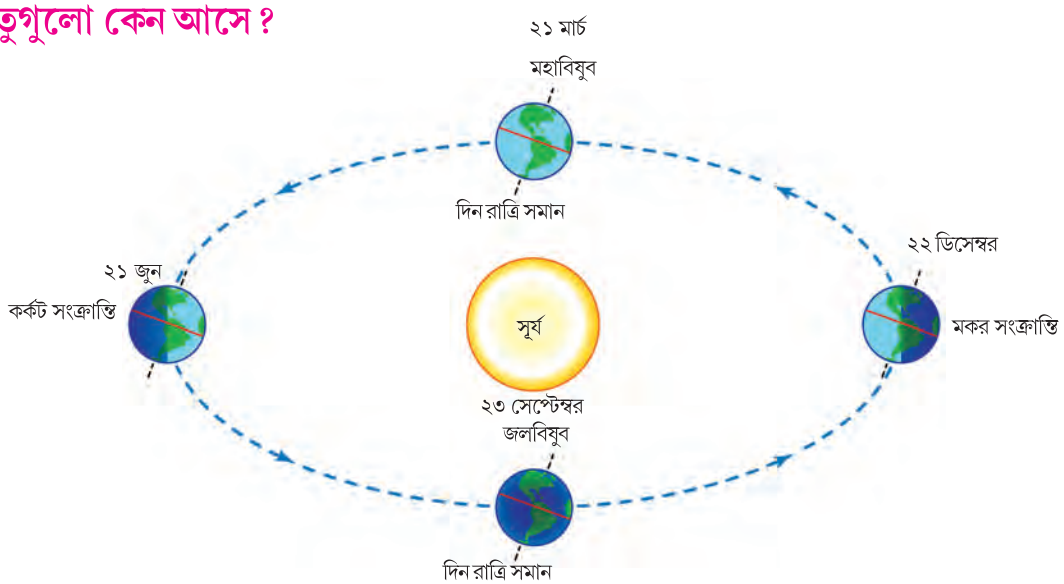

যখন উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে, তখন উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ **দিনগুলো বড়ো আর রাত ছোটো হতে থাকে।** অর্থাৎ দিনের আলো অনেকক্ষণ পাওয়া যায়। সারাদিন ধরে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। অথচ রাত ছোটো হওয়ায় তেমন ঠান্ডা হওয়ার সময় পায় না। দিনের পর দিন এরকম হলে গরম বাড়তে থাকে। এই সময়ে **উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি পড়ে অনেক লম্বভাবে।** তাই সূর্যের তাপও হয় প্রবল। এসময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।

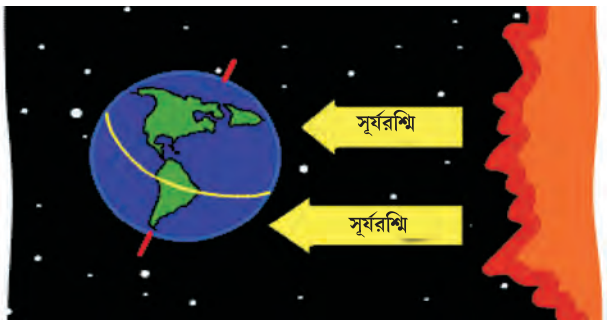

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল

আবার যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে , **উত্তর গোলার্ধে** তখন ক্রমশ **দিন ছোটো আর রাত বড়ো হতে থাকে।** দিনের আলো বেশিক্ষণ থাকে না বলে পৃথিবী বেশিক্ষণ ধরে উত্তপ্ত হয় না, রাতে ঠান্ডা হওয়ার সময় বেশি পায়। এইসময় **উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি বাঁকাভাবে পড়ে,** তাই কম উত্তপ্ত হয়। এসময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

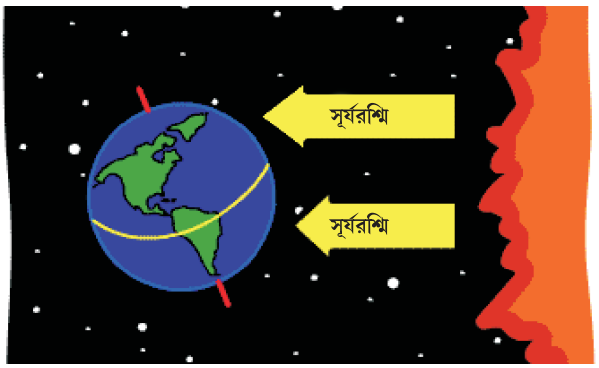

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

সূর্যের বার্ষিক আপাতগতি রবিমার্গ

সারাবছর সূর্যটা কি আকাশের ঠিক একই জায়গায় ওঠে? হয়তো অনেকেই লক্ষ করেছ শীতকালে সূর্যটা পুব আকাশে একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁষে আবার গ্রীষ্মকালে একটু উত্তর দিক ঘেঁষে ওঠে।

এরকম কেন হয়?

সূর্যের 'আপাতগতি' অর্থাৎ আপাতভাবে যা মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। ঠিক যেমন চলন্ত বাস-ট্রেন থেকে মনে হয় গাছপালা ঘরবাড়ি সব পিছন দিকে সরে যাচ্ছে। অথবা নাগরদোলা চড়লে মনে হয় সবকিছু ঘুরছে।

তেমনি পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে বলে আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে প্রতিদিন পুব আকাশ থেকে পশ্চিম আকাশে চলাচল করছে বলে মনে হয়। এটা সূর্যের **দৈনিক আপাত গতি**।

কীভাবে করবে?

প্রতি মাসের ১ বা ২ তারিখে সকালে দেখবে সূর্যটা কোথায় উঠছে। সেদিক বরাবর একটা লম্বা দাগ দিয়ে রাখবে।

• নির্দিষ্ট মাস	• সূর্য কোনদিক ঘেঁষে ওঠে
মার্চ	———
মে-জুন	———
সেপ্টেম্বর	———
নভেম্বর-ডিসেম্বর	———

হেলানো অক্ষের জন্য পৃথিবী কক্ষপথে এমনভাবে কাত হয়ে ঘোরে যে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তিরেখা ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষরেখা) এবং মকরক্রান্তিরেখায় ($২৩\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষরেখা) সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ফলে আপাতভাবে মনে হয় যে সূর্য পৃথিবীর বিষুবরেখা থেকে উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত চলাচল করে। এটাই সূর্যের **বার্ষিক আপাতগতি বা রবিমার্গ** (রবি = সূর্য, মার্গ = পথ)।

লক্ষ করেছ?

গরমকালে স্কুল থেকে ফিরে কতক্ষণ খেলা যায়। আর শীতকালে বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়—

একটা খাতায় লিখে রাখতে পারলে ঠিক বোঝা যাবে—গরমকালে আর শীতকালে কতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে।

একটা তালিকা বানিয়ে জুন মাসের প্রত্যেক সপ্তাহের একদিন করে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময়টা লিখে ফেলতে হবে। আবার ডিসেম্বর মাসেও প্রত্যেক সপ্তাহের একদিন করে লিখে ফেলতে পারলেই নিজেই বুঝতে পারবে গরমকালে আর শীতকালে কতটা ছোটো-বড়ো হয় দিন-রাত।

	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত	কত ঘণ্টা দিন
মার্চ			
জুন			
সেপ্টেম্বর			
ডিসেম্বর			

সূর্যের বার্ষিক আপাত গতি

বছরে দুটো দিন (২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর) বিষুবরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। আরও দুটো দিন ২১ জুন কর্কটক্রান্তিরেখায় এবং ২২ ডিসেম্বর মকরক্রান্তিরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ৬ মাস ধরে সূর্যের উত্তরমুখী আপাতগতি হলো **উত্তরায়ণ**। একইভাবে ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাস ধরে সূর্যের দক্ষিণমুখী আপাতগতি হলো **দক্ষিণায়ন**।

বলো তো

- সূর্যের বার্ষিক আপাতগতি
- দিন-রাতের ছোটো বড়ো হওয়া
- ঋতু পরিবর্তন
  —কী কারণে হয়?

নীচের বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নাও।

১. পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ
২. পৃথিবীর হেলানো অক্ষ
৩. আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি

(১, ২/২, ৩/১, ৩/১, ২, ৩)

গ্রীষ্ম ➲ শরৎ ➲ শীত ➲ বসন্ত

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল

পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ২১ মার্চ তারিখে এমন একটা জায়গায় চলে আসে যে বিষুবরেখায় লম্বভাবে সূর্যরশ্মি পড়ে। এই দিন পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সর্বত্রই **দিন-রাত্রি সমান** অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হয়। সব জায়গায় স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল ৬ টায় সূর্য ওঠে এবং সন্ধ্যা ৬ টায় অস্ত যায়। এই ঘটনাকে **'বিষুব'** (Equinox) বলা হয় ('বিষুব' কথার অর্থ 'সমান দিন ও রাত্রি')।

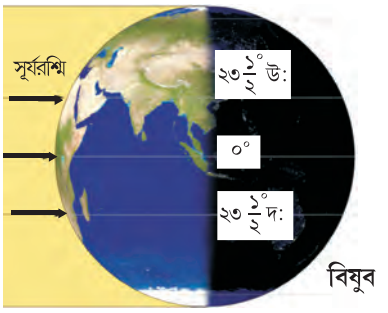

বাংলা ক্যালেন্ডার দেখেছো?

আমাদের দেশে ছটা ঋতু। কিন্তু নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং মেরু অঞ্চল ছাড়া সারা পৃথিবীতে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, বসন্ত এই চারটি ঋতুই প্রধান। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আর শরতের পর কিছুদিনের জন্য হেমন্তকাল আসে। গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত এই তিনটে ঋতু আমাদের দেশে অন্য ঋতুগুলোর থেকে অনেক বেশি দিন থাকে।

দিন এবং রাত প্রায় সমান হওয়ায় এই সময়ে (মার্চ-এপ্রিল মাস) আবহাওয়াটাও থাকে গরম ঠান্ডার মাঝামাঝি। উত্তর গোলার্ধে এই সময় বসন্তকাল। তাই ২১ মার্চের 'বিষুব' কে উত্তর গোলার্ধে **বসন্তকালীন বিষুব** বা **মহাবিষুব** বলা হয়।

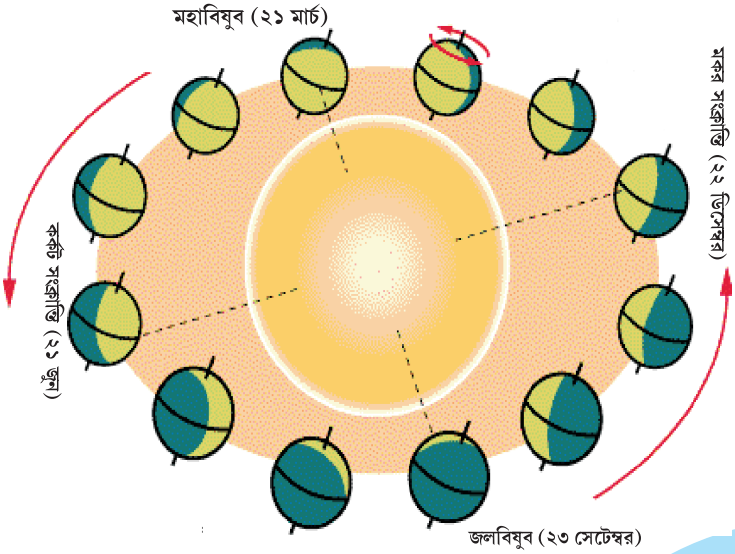

সূর্যঘড়ির ছায়া!

তোমার সূর্যঘড়িটায় ২১ মার্চ, ২১ জুন, আর ২২ ডিসেম্বরের দুপুর ১২ টায় সময় ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে দেখো।

কোনদিন সবথেকে ছোটো ছায়া পড়লো?---------

কোনদিন সবথেকে বড়ো ছায়া পড়লো?----------

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

২১ মার্চের বিষুবের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা জায়গায় আসতে থাকে যখন সূর্য রশ্মি ক্রমশ উত্তর গোলার্ধে লম্বভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন বড়ো (১২ ঘণ্টার বেশি) আর রাত ছোটো (১২ ঘণ্টার কম) হতে থাকে। সূর্যের উত্তরায়ণের এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

'সংক্রান্তি' (Solstice) তখন এবং এখন

বছরের সবথেকে বড়ো আর সবথেকে ছোটো দিনদুটো প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন কারণে (বছর গণনা, শস্যরোপণ) গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখনও ভারত, আয়ারল্যান্ড, চিন, দক্ষিণ আমেরিকায় সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচলিত।

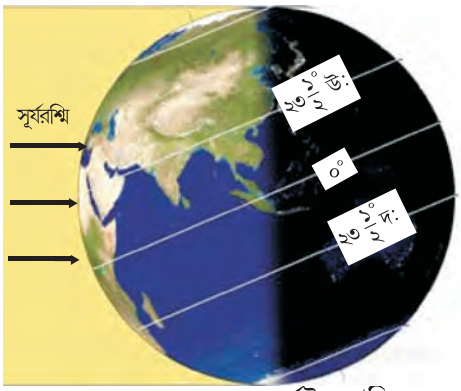

কর্কটসংক্রান্তি

২১ জুন পৃথিবী নিজ কক্ষপথে এমন একটা জায়গায় আসে যে উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি রেখার (২৩$\frac{১}{২}$° উত্তর অক্ষরেখা) ওপর লম্বভাবে সূর্যরশ্মি পড়ে। এই দিন **উত্তর গোলার্ধে দিন সবথেকে বড়ো আর দক্ষিণ গোলার্ধে সবথেকে ছোটো হয়**। সুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই সূর্যকে দেখা যায়। আর কুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। ২১ জুনকে **'কর্কটসংক্রান্তি' (Summer Solstice)** বলা হয়।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল

২১ জুনের পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। সূর্যের লম্বরশ্মি ক্রমশ বিষুবরেখার দিকে সরতে থাকে । ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কক্ষপথে পৃথিবী এমন একটা অবস্থানে আসে যে বিষুবরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ফলে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়। ২১ মার্চ এর মতো এই দিনটাও বিষুব। এই সময়ে (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর মাস) আবহাওয়া ঠান্ডা গরমের মাঝামাঝি থাকে। উত্তর গোলার্ধে এই সময় শরৎকাল। একারণে ২৩ সেপ্টেম্বরের বিষুবকে **শরৎকালীন বিষুব** বা **জলবিষুব** বলে।

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল

২৩ সেপ্টেম্বরের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থানে আসে যখন সূর্যের লম্বরশ্মি ক্রমশ দক্ষিণ গোলার্ধে পড়তে থাকে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো আর রাত ছোটো হতে থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়নের এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে শীতকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

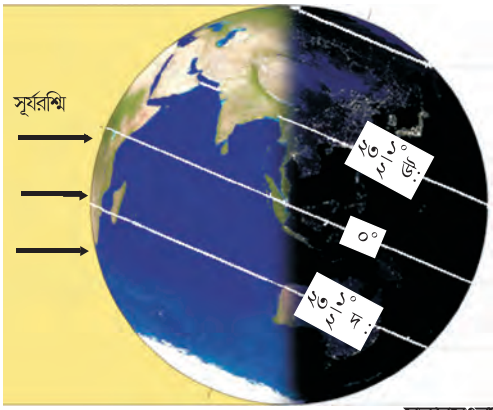

মকরসংক্রান্তি

২২ ডিসেম্বর পৃথিবী কক্ষপথের এমন অবস্থানে আসে যে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখার (২৩$\frac{১}{২}$° দক্ষিণ অক্ষরেখা) ওপরে সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। এই দিন দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবথেকে বড়ো আর উত্তর গোলার্ধে দিন সবথেকে ছোটো হয়। কুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই সূর্যকে দেখা যায় আর সুমেরুবৃত্তে ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। ২২ ডিসেম্বরকে **মকরসংক্রান্তি (Winter Solstice)** বলা হয়।

'বড়োদিন' কি আসলে বড়ো দিন ?

খেয়াল করেছো 'বড়োদিন' বা যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন (২৫ ডিসেম্বর), ২২ ডিসেম্বর মকরসংক্রান্তির কয়েকদিন পরেই। আসলে ঐ সময় থেকে উত্তর গোলার্ধে আবার দিন বড়ো হতে শুরু করে। তাহলে উত্তর গোলার্ধে 'বড়োদিন' কি আসলে 'বড়ো' দিন ?

‘আলোকিত’ রাত্রি
‘অন্ধকার’ দিন

ছোটোবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি দিনের পর রাত আর রাতের পরে দিন বাঁধা নিয়মে আসে আর যায়। কিন্তু দিনের আলো আর রাতের অন্ধকারের পালাবদলের ব্যাপারটা পৃথিবীর সব জায়গায় আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না।

অন্ধকার দিন

পৃথিবীর দুই মেরুবৃত্তে (৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ উত্তর এবং ৬৬ $\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে সুমেরু এবং কুমেরু) সারাবছরই সূর্যের আলো বাঁকাভাবে পড়ে। মার্চ থেকে জুলাই-এই সময়টায় উত্তর গোলার্ধে সুমেরু-বৃত্তীয় অঞ্চলে সূর্য কখনই দিগন্তের নীচ থেকে ওঠে না বা অস্ত যায় না। সূর্য প্রায় দিগন্তের সমান্তরালে আকাশের পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে চলাচল করে। এসময় ২৪ ঘণ্টাই একটানা দিনের আলো থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুসারে তখন রাত হওয়া সত্ত্বেও সূর্যকে আকাশে দেখা যায়। আবার সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি এর সময়টাও একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে কুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে এইরকম ‘আলোকিত রাত্রি’ সহ ‘একটানা দিন’ হয়।

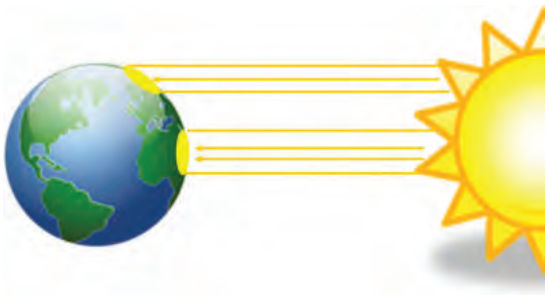

মধ্যরাত্রির সূর্য

মার্চ থেকে জুন বা জুলাই-এই সময়ে কানাডা, ডেনমার্ক, আলাস্কা, নরওয়ে,সুইডেন, আইসল্যান্ড-এর অনেক জায়গা থেকে স্থানীয় সময় অনুযায়ী গভীর রাত্রিতে কিছু সময়ের জন্য দিগন্তরেখায় সূর্যকে দেখা যায়। নরওয়ের উত্তরে হ্যামারফেস্ট বন্দরে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্যকে রাতের বেলায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় বলে একে **মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ** বলা হয়।

মধ্যরাত্রির সূর্য

সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী-এই সময়ে কয়েক মাস সুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে সূর্য একেবারেই ওঠে না। তখন দিনের পর দিন ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুযায়ী 'দিন' হওয়া সত্ত্বেও আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না। আবার মার্চ থেকে জুন এই সময়ে কুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চলেও এরকম 'অন্ধকার দিন' সহ একটানা রাত হয়।

সুমেরু প্রভা (Aurora Borealis), কুমেরু প্রভা (Aurora Australis)

দুই মেরুপ্রদেশে একটানা রাত চলার সময় মাঝে মাঝে আকাশে রংধনুর মতো রঙিন আলোর জ্যোতি (অরোরা) দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নিত গ্যাসের সঙ্গে সূর্যরশ্মির সংঘর্ষের ফলে মেরু অঞ্চলের আকাশে এরকম বিচ্ছুরিত আলোর সৃষ্টি হয়।

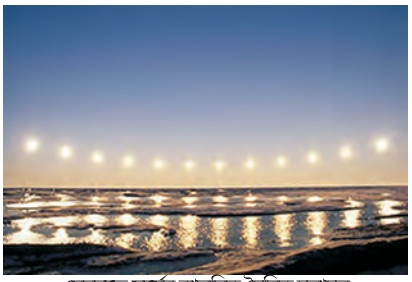
মেরুবৃত্তে সূর্যের কাল্পনিক দৈনিক চলাচল

সুমেরু এবং কুমেরুতে আবার একটানা ছমাস দিন এবং ছ মাস রাত হয়। সূর্যের উত্তরায়ণের সময় সুমেরুতে টানা ছমাস দিন হয়। ঐ সময় কুমেরুতে ছমাস রাত হয়। দক্ষিণায়নের সময় কুমেরুতে টানা ছমাস দিন এবং ঐ সময় সুমেরুতে ছমাস রাত হয়। দুই মেরু অঞ্চলে একটানা রাত-এর সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। আবার দিন-এর সময়টাও তাপমাত্রা খুবই কম থাকে।

বিভিন্ন রকম অরোরা

!! মগজাস্ত্র !!

● **ভেবে দেখো, ঠিক পারবে।**

● পৃথিবীর অক্ষটা যদি পৃথিবীর কক্ষের ওপর লম্ব হতো? (বৃহস্পতির অক্ষটা এরকমই কক্ষের ওপর লম্ব)

● পৃথিবীর অক্ষ যদি কক্ষপথের সমতলে থাকতো? (ইউরেনাস এর অক্ষটা এরকমই)

— এই দুটো ক্ষেত্রে দিন-রাত এবং ঋতুপরিবর্তন কেমন হতো বলো তো?

● পৃথিবীর কোথায় সারাবছরই দিন রাত সমান থাকে?

● ২১ মার্চ তারিখে স্থানীয় সময় অনুযায়ী কটার সময় টোকিয়ো, কলকাতা, সিডনিতে সূর্য উঠবে?

● ৪ জুলাই , ২৫ জানুয়ারি, ২০ সেপ্টেম্বর বিষুবরেখার যে কোনো জায়গায় কখন সূর্য উঠবে?

● ২৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময়ে কটার সময় নিউ ইয়র্ক, দিল্লি, কায়রোতে সূর্য ডুববে?

ঋতুবৈচিত্র্য ও আমরা

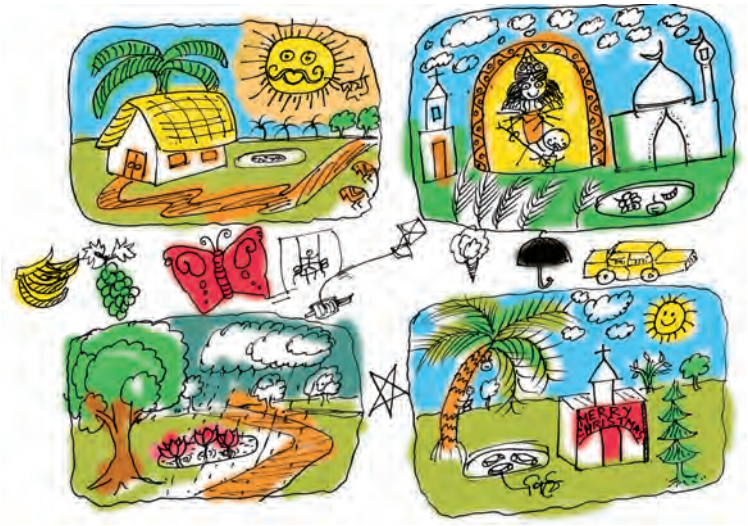

রিয়া আর পিন্টু মিলে এই ছবিটা এঁকেছে। তুমিও তোমার মতো এঁকে ফেলো ঋতুগুলো ও তার ফল, ফুল, সবজি, গাছপালা, বিভিন্ন উৎসব, খাবার দাবার।

ঋতুবৈচিত্র্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—সময় গণনা, ক্যালেন্ডার তৈরি, কৃষিকাজ,অন্যান্য জীবিকা,বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব সবই ঋতুনির্ভর। উদ্ভিদ-প্রাণীর সঠিক বৃদ্ধি, বিকাশ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্যও ঋতু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। সারাবছর ধরে ঋতুগুলোর যাওয়া আসার ফলে আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য,উৎসাহ আসে যা আমাদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে।

ভেবে দেখেছো, উত্তর আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতুগুলো উল্টো ??

বিশেষ দিন	উত্তর গোলার্ধ		ঋতু অনুযায়ী ফুল, ফল, উৎসবের নাম	দক্ষিণ গোলার্ধ	
২১ মার্চ	দিন-রাত্রি সমান হয়	বসন্তকাল	পলাশ, জলপাই, হোলি	দিন-রাত্রি সমান	শরৎকাল
২১ জুন	সবচেয়ে বড়ো দিন	গ্রীষ্মকাল	_____ _____	সবচেয়ে ছোটো _____	_____
২৩ সেপ্টেম্বর	_____ _____	শরৎকাল	শিউলি, কাশ আতা, দুর্গাপুজো	_____ _____	বসন্তকাল
২২ ডিসেম্বর	সবচেয়ে ছোটো _____	শীতকাল	_____ _____	সবচেয়ে বড়ো দিন	_____

মজার খেলা-শব্দ সন্ধান

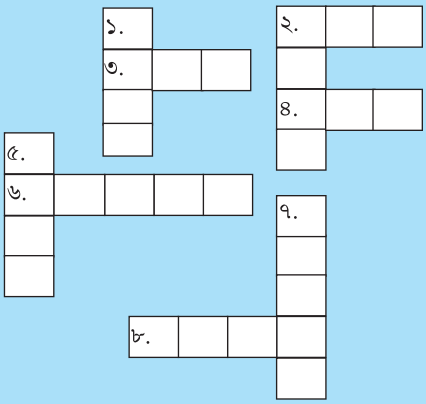

উপরনীচ

১. সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি
২. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সব থেকে কম হয় যে অবস্থানে।
৫. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সব থেকে বেশি হয় যে অবস্থানে।
৭. এই বলের জন্য পৃথিবী সমস্ত কিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

পাশাপাশি

২. মেরু প্রভার অপর নাম।
৩. সমান দিন ও রাত্রি।
৬. বার্ষিক গতির অপর নাম।
৪. উত্তর মেরুকে যা বলে।
৮. যে বছরে ৩৬৬টা দিন থাকে।

হাতে কলমে

- কোন কোন ঋতুতে বেশিরভাগ দিন নীল আকাশ দেখা যায়?
- কোন ঋতুতে মাঠের মাটি ফেটে যায়?
- কোন ঋতুতে পুকুরগুলো জলে ভর্তি থাকে?
- কোন কোন ঋতুতে বন্যার সম্ভাবনা থাকে?
- কোন কোন ঋতুতে ডোবা,খাল, বিল ছেঁচে মাছ ধরা হয়?
- কোন ঋতুতে সূর্য পূর্ব আকাশের সবথেকে দক্ষিণ ঘেঁষে ওঠে?
- কোন ঋতুতে দুপুর ১২টায় ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয়?
- কোন ঋতুতে খুব কোকিল ডাকে?
- উত্তর গোলার্ধে কোন ঋতুতে সবথেকে বড়ো দিন হয়?
- ২৫ ডিসেম্বর ‘বড়োদিন’ এ দক্ষিণ গোলার্ধে গরম না ঠান্ডা?
- বিজ্ঞানীরা আন্টার্কটিকা মহাদেশ অভিযানে ডিসেম্বর মাসে কেন যান?
- জুলাই না জানুয়ারি কোন মাসে আমরা সূর্যের বেশি কাছে আসি?

২ ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

পৃথিবী যে প্রায় গোলাকার তা আমরা সকলেই জানি। তোমাদের খেলার বল, মার্বেল বা গ্লোবকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র রূপ বলে ধরা যেতে পারে। ওইরকম কোনো জিনিসের ওপর কোনো একটা বিন্দু নাও। **কিন্তু বিন্দুটা বল বা মার্বেলটার ঠিক কোথায় অবস্থিত তা তুমি বলতে পারো কি?** পাড়ার যেকোনো বাড়ি ঠিক কোথায় কেউ জিজ্ঞেস করলে সহজেই বলে দেওয়া যায়। কিন্তু **সেই জায়গাটাই পৃথিবীর ওপর ঠিক কোথায় তুমি কীভাবে বোঝাবে?**

সাদা মার্বেলের ওপর কোনো বিন্দু যার ঠিক অবস্থান আমাদের জানা নেই।

সাদা মার্বেলটার ওপরে যে বিন্দুটা দেখানো হয়েছে, তার অবস্থান কোথায়? — কেউ বলবে মার্বেলটার পূর্ব দিকে, কেউবা বলবে মার্বেলটার উত্তর দিকে। কিন্তু মার্বেলটা ঘুরিয়ে বিন্দুর জায়গাটা নীচের দিকে বা অন্য কোনো দিকে করে দিলেই বিন্দুর অবস্থান পাল্টে যাবে।

তাহলে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করবে?

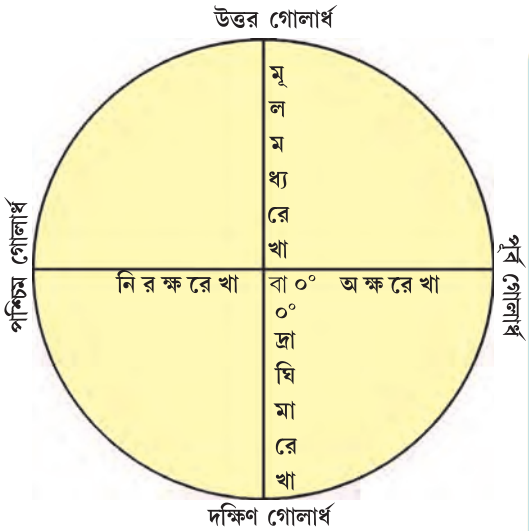

নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখা দ্বারা গোলার্ধভাগ

আমরা যা জানি

পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কল্পিত রেখা হলো—

- **নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বা ০° অক্ষরেখা।**
- **মূলমধ্যরেখা বা ০° দ্রাঘিমারেখা।**

নিরক্ষরেখা পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে সমান দুটি অংশে ভাগ করে, উত্তরের অংশ উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণের অংশ দক্ষিণ গোলার্ধ। মূলমধ্যরেখাকে গ্রেটার লন্ডনের রয়্যাল গ্রিনিচ নামক স্থানের ওপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। মূলমধ্যরেখাও পৃথিবীকে দুটি সমান ভাগে ভাগ করে। পূর্বের অংশ পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিমের অংশ পশ্চিম গোলার্ধ ।

এবার একটা মজার খেলা...

- মানচিত্র বই নিয়ে দলে ভাগ হয়ে নাও।
- পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিভিন্ন শহরের নামের তালিকা তৈরি করো। প্রতিটা মহাদেশ থেকেই শহরগুলো নেওয়ার চেষ্টা করো।
- এবার লক্ষ করতে হবে সেগুলো কোন গোলার্ধের অন্তর্গত।
- সেইমতো তালিকায় (✓) চিহ্ন দাও।
- তারপর গোলার্ধ ভাগ করা অংশে সাংকেতিক চিহ্ন বসাও। যেমন কলকাতার জন্য 'ক'।
- নমুনা লক্ষ করো।

শহরের নাম	কলকাতা					
উত্তর-পূর্ব অংশ	✓					
দক্ষিণ-পূর্ব অংশ						
উত্তর-পশ্চিম অংশ						
দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ						

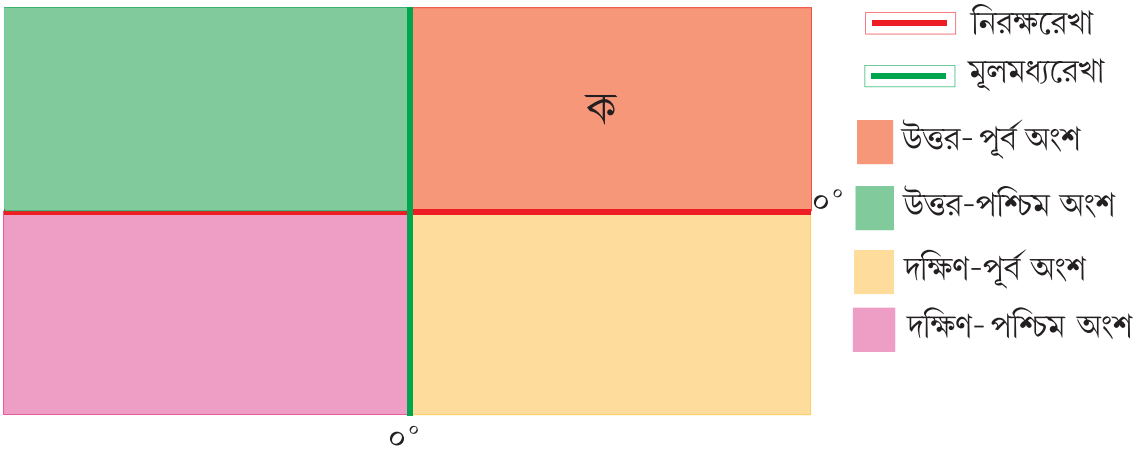

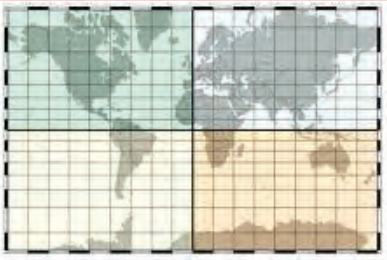

একটা গ্লোব বা মানচিত্র খেয়াল করলে দেখা যায় পৃথিবীর ওপর কতকগুলো আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দাগ কাটা আছে।

কালো দাগগুলো কী?

নিরক্ষরেখার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত রেখাগুলো হলো **অক্ষরেখা** (Parallels of Latitude)।

পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাগুলো হলো **দ্রাঘিমারেখা** (Meridians of Longitude)।

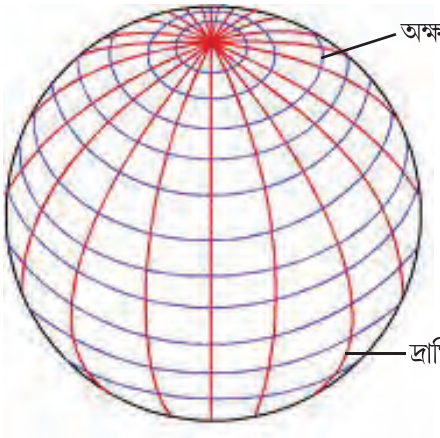

উভয় রেখা পৃথিবীর ওপর জালের (Grid) মতো বিস্তার করে আছে।

আমরা জানি গ্লোব হলো পৃথিবীর ছোটো প্রতিরূপ।

অক্ষরেখার পরিচয়

- অক্ষরেখা পরস্পর সমান্তরাল।
- অক্ষরেখাগুলো পূর্ণবৃত্ত।
- অক্ষরেখা ডিগ্রিতে (°) পরিমাপ করা হয়।
- অক্ষরেখার পরিধি ক্রমশ মেরুর দিকে কমে যায়।
- অক্ষরেখার মান মেরুর দিকে বেড়ে যায়।
- অক্ষরেখার মধ্যে নিরক্ষরেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিরক্ষরেখার মান ০°।
- ৯০° উ: এবং ৯০° দঃ হলো যথাক্রমে উঃ মেরু বিন্দু এবং দঃ মেরুবিন্দু।

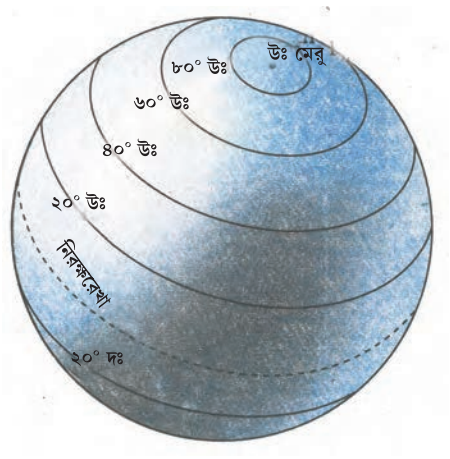

অক্ষরেখা

একটা বলের ওপর অক্ষরেখা, নিরক্ষরেখা, উত্তর-দক্ষিণ মেরুবিন্দু এঁকে তৈরি করো তোমার ছোটো পৃথিবী।

নিরক্ষরেখার মান ০°। নিরক্ষরেখার উত্তরের অক্ষরেখাগুলো হলো '**উত্তর অক্ষরেখা**'। নিরক্ষরেখার দক্ষিণের অক্ষরেখাগুলো হলো '**দক্ষিণ অক্ষরেখা**'। প্রতি ডিগ্রি অক্ষরেখাকে ৬০'(মিনিট)-এ ও প্রতি মিনিট অক্ষরেখাকে ৬০''(সেকেন্ড)-এ ভাগ করা হয়েছে।

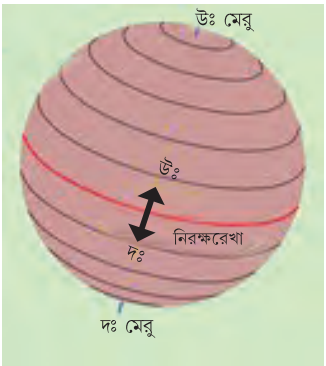

'উঃ' ও 'দঃ' অক্ষরেখা

অক্ষরেখা উত্তর গোলার্ধের হলে 'উঃ' ও দক্ষিণ গোলার্ধ হলে 'দঃ' ব্যবহার করা হয়। দুটি মেরু বিন্দুর মান ৯০° উঃ ও ৯০° দঃ।। কোনো স্থান নিরক্ষরেখা থেকে কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে তা বোঝাতেই অক্ষরেখার প্রয়োজন হয়। যেমন, কলকাতা অবস্থান করছে ২০°৩৪' উঃ অক্ষরেখার ওপর। তাহলে আমরা বলতেই পারি পৃথিবীতে কলকাতার অবস্থান ২০°৩৪' উঃ।

অক্ষাংশ

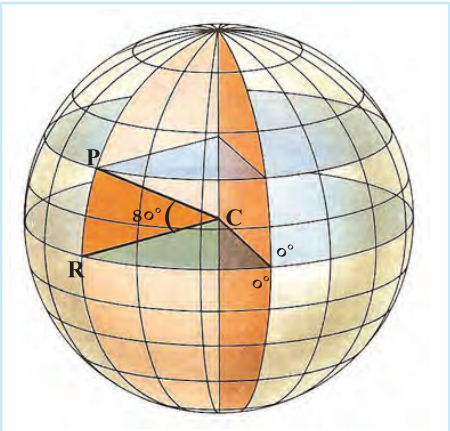

একটা কাচ বা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ বলকে পৃথিবী বলে ধরে নাও। C ওই বলটার তথা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু C থেকে নিরক্ষরেখা পর্যন্ত টানা সরলরেখা হলো CR। P হলো এমন যে কোনো বিন্দু যা বলটার ওপর মানে পৃথিবীর ওপর আছে। PC হলো, P বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত টানা সরলরেখা। PC ও CR, C বিন্দুতে ৪০° কোণ (∠) তৈরি করেছে। সুতরাং P বিন্দুর অক্ষাংশ হলো ৪০° উঃ। P স্থানটি নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত। এভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের যে কোনো জায়গা পৃথিবীর কেন্দ্রে, নিরক্ষরেখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত টানা সরলরেখার সঙ্গে যে কোণ (∠) তৈরি করে, তাই হলো ওই স্থানের **অক্ষাংশ**। একই অক্ষাংশ যুক্ত স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে একই কোণ তৈরি করে। সোজা কথায় একই অক্ষাংশ যুক্ত স্থানগুলোকে যদি একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় তবে সেই রেখাটাই হবে অক্ষরেখা। এক্ষেত্রে ওই অক্ষরেখার মান হবে ৪০° উঃ।

- বাড়িতে যদি ছুরি দিয়ে তরমুজকে ছবির মতো করে কেটে দেখো, তাহলে অক্ষাংশের ধারণাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

তরমুজ কেটে অক্ষাংশ দেখা

আর একটা মজার খেলা.....

দলে ভাগ হয়ে পৃথিবীর মানচিত্র দেখে বিভিন্ন শহরের যে তালিকা তৈরি করেছিলে, সেই তালিকার শহরগুলো কত ডিগ্রি (°) অক্ষরেখায় আছে? মোটামুটিভাবে কাছাকাছি অক্ষরেখা দেখলেই হবে। নীচের ছকে সেগুলোকে বসাও:

শহরের নাম	কলকাতা									
কত ডিগ্রি অক্ষরেখা										

দ্রাঘিমারেখা

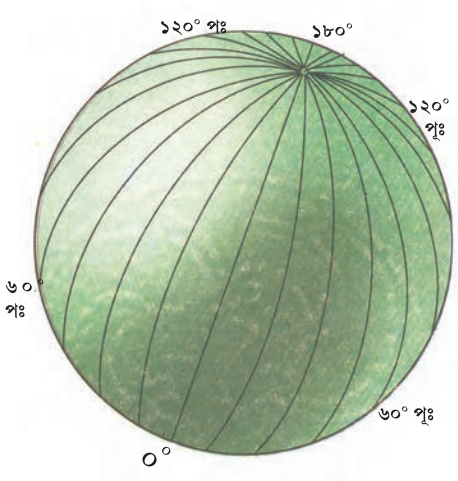

বিভিন্ন শহরের অক্ষাংশ বের করতে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, একাধিক জায়গায় একই অক্ষরেখায় একে অপরের পূর্ব-পশ্চিমে রয়েছে। কোনো স্থান পৃথিবীরপৃষ্ঠের কতটা উত্তরে বা কতটা দক্ষিণে তা অক্ষাংশের দ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ওপরে বিভিন্ন স্থান একে অপরের কতটা পূর্বে বা কতটা পশ্চিমে সেটা কীভাবে নির্ণয় করা যাবে? তাহলে, শুধু অক্ষরেখা নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো জায়গার ঠিক অবস্থান বোঝাতে আরও বেশি কিছু দরকার।

পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থান কতটা পূর্বে বা কতটা পশ্চিমে তা ঠিক করতে মূলমধ্যরেখার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মূলমধ্যরেখার মান ০°। মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে উত্তর মেরু বিন্দু থেকে দক্ষিণ মেরু বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত লম্বালম্বি রেখাগুলো হলো দ্রাঘিমারেখা।

- মানচিত্র বই থেকে একই অক্ষরেখায় অবস্থিত এরকম বিভিন্ন জায়গার নামের তালিকা চটপট তৈরি করে ফেলো।

দ্রাঘিমারেখার পরিচয়

- দ্রাঘিমারেখা পরস্পর সমান্তরাল নয়।
- দ্রাঘিমারেখাগুলো অর্ধবৃত্ত।
- দুটি দ্রাঘিমারেখার মধ্যে দূরত্ব নিরক্ষরেখার কাছে সবচেয়ে বেশি। নিরক্ষরেখার থেকে মেরুর দিকে ক্রমশ দূরত্ব কমে যায়।
- প্রত্যেকটি দ্রাঘিমারেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে মিশেছে
- ১৮০° পূর্ব এবং ১৮০° পশ্চিম যেহেতু একটাই দ্রাঘিমা রেখা, তাই তার পূঃ ও পঃ উল্লেখ করতে হয় না।

মূলমধ্যরেখার পূর্বের দ্রাঘিমারেখা হলো 'পূর্ব দ্রাঘিমা'। মূলমধ্যরেখার পশ্চিমের দ্রাঘিমারেখা হলো 'পশ্চিম দ্রাঘিমা'। দ্রাঘিমা রেখা পূর্ব গোলার্ধের হলে 'পূঃ' ও পশ্চিম গোলার্ধের হলে 'পঃ' ব্যবহার করা হয়। দ্রাঘিমারেখাও ডিগ্রি (°) তে পরিমাপ করা হয়। অক্ষরেখার মতো প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমারেখাকে ৬০′ (মিনিট) ও প্রতি মিনিটকে ৬০″ (সেকেন্ডে) ভাগ করা হয়েছে। এই মিনিট বা সেকেন্ড কিন্তু কোনোটাই সময়ের মিনিট বা সেকেন্ড নয়।

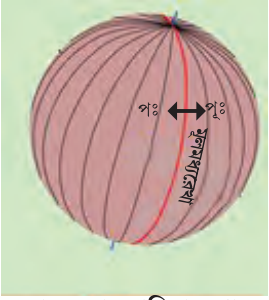

পূঃ ও পঃ দ্রাঘিমারেখা

দ্রাঘিমাংশ

অক্ষাংশ বোঝবার সময় আমরা দেখেছি কীভাবে দুটি সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণ (∠) তৈরি করে। দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূলমধ্যরেখাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখা হিসাবে ধরা হয়। ভূ-গোলকে মূলমধ্যরেখা (০° দ্রাঘিমারেখা) থেকে একটি সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র (C বিন্দু) পর্যন্ত টানা হয়েছে। P নামক স্থানটি যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত সেখান থেকেও অপর একটা সরলরেখা কেন্দ্র পর্যন্ত টানা আছে। ওই দুই সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ (∠ RCP) তৈরি করেছে সেটাই দ্রাঘিমাংশ। ধরা যাক তার মান ৬০°। অতএব স্থানটির দ্রাঘিমাংশ হবে ৬০° পঃ। সহজ করে বলতে গেলে একই দ্রাঘিমাংশ যুক্ত স্থানগুলোকে যদি একটা সরলরেখা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় তবে সেই সরলরেখাটাই হবে দ্রাঘিমারেখা।

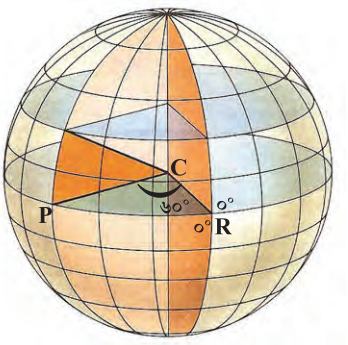

বাড়িতে আপেল বা সবেদা লম্বালম্বিভাবে একফালি কেটে নিলে দ্রাঘিমাংশের ধারণা পাওয়া যায়। ফালিটি সরিয়ে নেওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। ওই ফাঁকা জায়গার দুপাশে দুটো দেয়াল দেখা যায়। ওই দেয়ালের একটিকে মূলমধ্যরেখার দেয়াল আর অন্যটিকে যে কোনো জায়গার দ্রাঘিমার দেয়াল ভেবে ফেলা যায়। ঐ দুটি দেয়ালের মাঝখানে যে কোণ (∠) তৈরি হয়েছে সেটাই দ্রাঘিমার মান।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের গ্রিনিচ-এ আছে রয়্যাল **অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অভজারভেটরি**। সেখানে একটি সংকর ধাতুর তৈরি দণ্ড রাখা আছে। সেটি ০° দ্রাঘিমারেখাকে (মূলমধ্যরেখা) চিহ্নিত করে। পর্যটকরা ঐ দণ্ডটার দুই দিকে দুই পা রেখে নিজের ছবি ক্যামেরা বন্দি করে। এক পা পূর্ব গোলার্ধে, আরেক পা পশ্চিম গোলার্ধে থাকে। কী মজার ব্যাপার না!

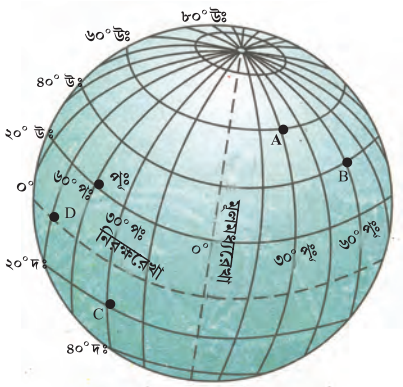

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পারস্পরিক ছেদ বিন্দু দিয়েই ভূপৃষ্ঠে কোনে স্থানের অবস্থান নির্ধারিত হয়।

খুব সহজে ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্ণয় করে ফেলো

স্থান	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
A		
B		
C		
D		
E		

ভেবে দেখো —

নিরক্ষরেখা থেকে মেরুর দিকে গেলে, কী কী পরিবর্তন লক্ষ করবে?

সূত্র: সূর্যরশ্মি মেরুর দিকে ক্রমশ তির্যক ভাবে পড়ে।

মগজাস্ত্র.....

- একই অক্ষরেখা বরাবর স্থানগুলোতে একই সময়ে দিন ও রাত হয় কি? যদি না হয় তাহলে কেন হয় না?
- দুটো অক্ষরেখার মাঝখানে কোনো স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা হবে?
- কোথায় গেলে পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধ উভয়ই একই সঙ্গে দেখতে পাবে?

ভেবে দেখো তো!

নিরক্ষরেখা বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে গেলে কী অভিজ্ঞতা হবে?

(১) মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্বে গেলে সে 'সময়' এগিয়ে যেতে দেখবে, কারণ সূর্য পূর্ব দিকে আগে ওঠে। পৃথিবী যেহেতু পশ্চিমে থেকে পূর্বে ঘুরছে তাই এরকমটা হয়।

(২) মূলমধ্যরেখা থেকে পশ্চিমে গেলে সময় পিছিয়ে যেতে দেখবে। কারণ পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় পরে হয়। এভাবে শুধু মূলমধ্যরেখা থেকে নয়, যেকোনো দুটি স্থান পরস্পর পরস্পরের পূর্বে বা পশ্চিমে থাকলে একই ঘটনা হবে।

(৩) একটি বৃত্তের মোট কোণ-এর পরিমাণ ৩৬০°। পৃথিবীও আবর্তনের সময় ৩৬০° কোণ ঘুরে আসে। সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। সুতরাং ১ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘোরে ৩৬০°/২৪ ঘণ্টা =১৫°। অতএব ১° ঘুরতে সময় লাগে ৪ মিনিট।

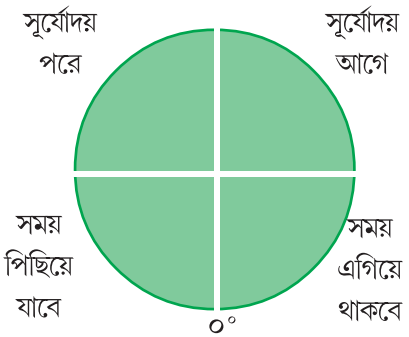

প: ← বিকেল ৫টা → পূ:

তিনজনে তিনটি আলাদা দ্রাঘিমায় আছে। সাবিনা আর পিকু–কার সময় মন্দিরার চেয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকবে বলতে পারো?

পৃথিবীর মানচিত্রে দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখাগুলো এঁকে দেখাও

জানার দৌড়ে পিছিয়ে থেকো না

মূলমধ্যরেখার ওপরে যখন সূর্য আসে তখন ঠিক দুপুর ১২ টা। মূলমধ্যরেখা থেকে ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমায় তখন দুপুর ১ টা। আবার ১৫° পশ্চিম দ্রাঘিমায় সেই সময় সকাল ১১ টা। দ্রাঘিমা অনুযায়ী কোনো স্থানের সময়কে সেই স্থানের **স্থানীয় সময়** (**Local Time**) বলে। কোনো দ্রাঘিমায় সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন দুপুর ১২টা হয়।

একটা গোটা দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। যেমন, ভারতের পূর্ব সীমানা ও পশ্চিম সীমানার মধ্যে সময়ের পার্থক্য প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। একটা দেশের একটাই সময় ঠিক না করলে নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। তাই ভারতের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা এড়াবার জন্য ঠিক মাঝ বরাবর ৮২°৩০′ পূঃ দ্রাঘিমাকে **প্রমাণ দ্রাঘিমা** (**Standard meridian**) ধরা হয়েছে। ৮২°৩০′ পূঃ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে সারা ভারতের **প্রমাণ সময়** (**Indian Standard Time**) বলে ধরা হয়। গ্রিনিচের সঙ্গে ভারতের প্রমাণ সময়ের পার্থক্য ৫ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ভারত গ্রিনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত। কোনো অনুষ্ঠান যদি লন্ডনে বিকেল ৫ টায় শুরু হয় তবে ভারতের টেলিভিশনে সরাসরি দেখা যাবে[বিকেল ৫ টা + ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট = রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটে]। তাহলে ভেবে দেখো লন্ডনে যখন বিকেলবেলা তখন ভারতে রাত হয়ে গেছে।

GPS

পৃথিবীর যেকোনো জায়গার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানবার একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা হল **GPS** বা **গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম** (**Global Positioning System**)। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। বর্তমানে জাহাজে, বিমানে, আধুনিক গাড়ি, মোবাইল ফোনে GPS থাকে।

মগজাস্ত্র.....

- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনা করে দেখাও।
- একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত জায়গাগুলোর স্থানীয় সময় এক হয় কেন?
- পৃথিবীর কোন দিকে গেলে সময় এগিয়ে যায় এবং কেন?
- লন্ডন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভারতে সরাসরি রাত ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়। লন্ডনে ওই অনুষ্ঠান কখন আরম্ভ হয়েছিল?
- ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা যায় তার একটি সহজ ব্যাখ্যা দাও। প্রয়োজনে চিত্র অঙ্কন করে বোঝাও।

নীচের ছকে বিভিন্ন জায়গার অবস্থান দেখানো হয়েছে। নীচের তালিকা দেখে বিন্দুর অবস্থান মিলিয়ে সংখ্যা বসাও। নমুনা লক্ষ করো।

আমি নন্দিনী। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমাকে খুঁজে বার করো তো দেখি? খেলাটা কিন্তু মজার!!!

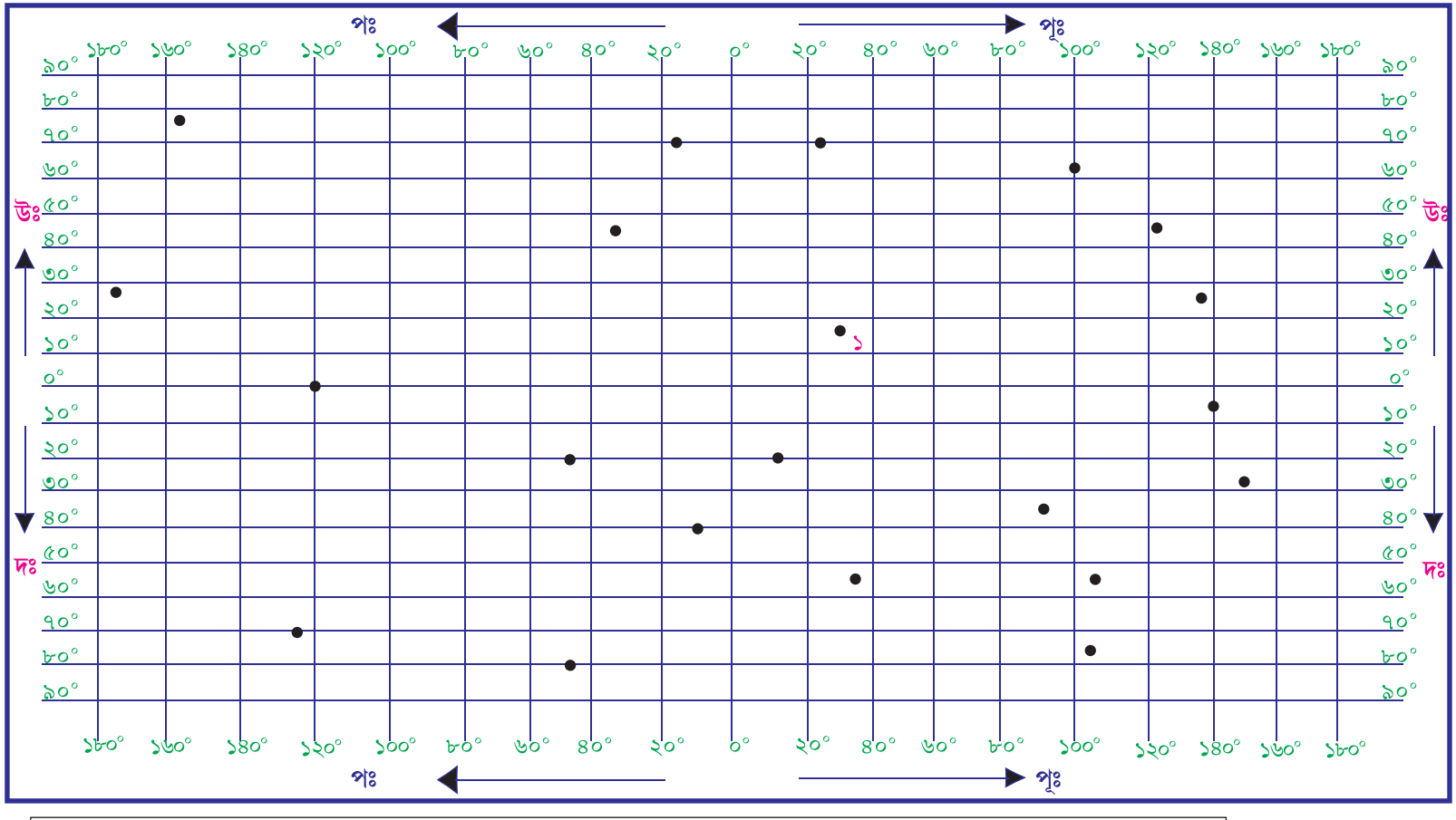

নন্দিনী আছে				
১. ১৮° উঃ, ৩০° পূঃ	২. ২৭° উঃ, ১৭৫° পঃ	৩. ০° , ১২০° পঃ	৪. ৫৪° দঃ, ১০৫° পূঃ	৫. ৭০° দঃ, ১২৫° পঃ
৬. ৬৩° উঃ, ১০০° পূঃ	৭. ১০° দঃ, ১৫° পূঃ	৮. ৪৫° উঃ, ১২৫° পূঃ	৯. ৪৫° উঃ, ৩২° পঃ	১০. ২৭° দঃ, ১৫০° পূঃ
১১. ৩৬° দঃ, ৯০° পূঃ	১২. ৪০° দঃ, ১০° পঃ	১৩. ২৫° উঃ, ১৩৫° পূঃ	১৪. ৭৫° উঃ, ১৫৫° পঃ	১৫. ৮০° দঃ, ৪৫° পঃ
১৬. ৭০° উঃ, ১৮° প	১৭. ৫৬° দঃ, ৩৫° পূঃ	১৮. ১৮° দঃ, ৪৫° পঃ	১৯. ৫° দঃ, ১৪০° পূঃ	২০. ৭৮° দঃ, ১০৫° পূঃ

৩ বায়ুচাপ

- শ্বাস নেওয়ার সময় বুকটা ফুলে ওঠে? কারণ? শ্বাস নিয়ে তুমি বেশি বাতাস বুকে ঢোকাও, তাই ঐ বাতাসের জন্য বেশি জায়গা লাগে।

- বোতল বা গ্লাস থেকে সরু নলে করে যখন শরবত খাও তখন প্রথমে নলের ভেতরের বাতাস টেনে নাও বলেই ঐ ফাঁকা জায়গাটা ভরতে নলের মধ্যে জলটা উঠে আসে।

- বেলুনে বা সাইকেলের টিউবে হাওয়া ভরার সময় হাওয়া বেশি হয়ে গেলে কী হয়? - শব্দ করে ফেটে যায়।

- বাতাসের বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, কিন্তু আয়তন আছে, ওজন আছে। বাতাস যখন বয়ে যায় তখন তাকে অনুভব করা যায়। গাছের পাতা নড়ে, নৌকার পাল ওড়ে, ঝড়ের সময় গাছপালা, ঘরবাড়ি ভেঙে যায়।

বায়ুর কী চাপ আছে?

এই মুহূর্তে যখন তুমি এই বইটা পড়ছো, জানো কি তোমার চারপাশের বাতাস তোমার উপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এই চাপ প্রায় ১ কিলোগ্রাম! আর প্রতি বর্গফুটে প্রায় ১টন।

তবুও তুমি এই প্রচণ্ড চাপ বুঝতে পারছো না কেন?

তোমার শরীরের ভিতরও বাতাস আছে। আর সেই বাতাসও বাইরের বাতাসের সমান এবং বিপরীত চাপ দিচ্ছে। তাই তুমি বাইরের বাতাসের চাপ বুঝতে পারছো না।

বায়ু চাপ দেয় কেন?

কঠিন,তরল বা গ্যাসীয় সব পদার্থই অসংখ্য অণু দিয়ে তৈরি। কঠিন বা তরল পদার্থকে আমরা দেখতে পেলেও, গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসকে আমরা দেখতে পাই না। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো আলগাভাবে

পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে বা চাঁদে কোনো বাতাস নেই, তাই মহাকাশচারীদের বিশেষ ধরনের পোশাকে বাতাস ভরা থাকে। তা না থাকলে তাদের শরীরের ভিতরের বাতাসের চাপে শিরা-ধমনি ফেটে যেতে পারে।

ঘুরে বেড়ায়,পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগায়, কোনো বস্তুর সঙ্গে বাতাসের এই অণুগুলোর যখন ধাক্কা লাগে,তখন এই ধাক্কার কারণে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তাইই সাধারণভাবে বায়ুচাপ। আয়তন যত কমে অণুগুলোর মাঝের দূরত্ব তত কমে। ফলে ঘনত্ব বাড়ে, প্রতি সেকেন্ডে অণুগুলোর ধাক্কাও বাড়ে, যার ফলে চাপও বাড়ে। **দৈনন্দিন জীবনে এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে বায়ুচাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**

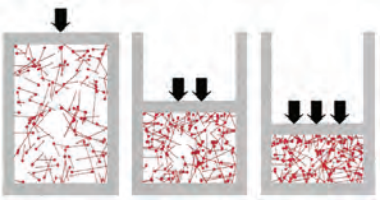

খুদে গোয়েন্দাদের জন্য ধাঁধাঁ, চটপট সমাধান করতে হবে!

দুটো মজার পরীক্ষা। প্রথমে নিজে করে দেখো, বুঝে নিয়ে তারপর বন্ধুদের অবাক করতে হবে!

✸ একটা বড়ো জলের বোতল বা দুধের বোতল, মুখ খোলা অবস্থায় টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখো। এবার কাগজ পাকিয়ে ছোটো বল- এর মতো বানাও। বলটা যেন বোতল-এর খোলা মুখের প্রায় অর্ধেক মাপের হয়। এবার বলটাকে ফুঁ দিয়ে বোতলের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করে দেখো।

● বন্ধুদের সঙ্গে নিয়েও পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো। যে যত জোরেই ফুঁ দিয়ে চেষ্টা করুক না কেন, বলটা কিছুতেই বোতলের মধ্যে ঢুকবে না। কেন ঢুকবে না বলোতো?

✸ আর একটা পরীক্ষা।

একটা কাচের গ্লাসের তলার দিকে কিছুটা কাগজ পাকিয়ে এমনভাবে আটকিয়ে রাখো, যাতে গ্লাসটা উপুড় করলেও কাগজটা না পড়ে। এবার একটা জল ভর্তি বড়ো গামলা বা বালতির মধ্যে গ্লাসটা উপুড় করে জলে ডুবিয়ে ধরে রাখো। গ্লাসের ভিতরের কাগজটা জলে ভিজে যাওয়া উচিত, তাইতো?

● জল থেকে তুলে দেখো তো ভিজলো কিনা। এবার গ্লাসটাকে জলে ডুবিয়ে দেখো, কাগজটা ভিজে যাবে।

● ভাবতে হবে, উপুড় করা গ্লাসে কাগজটা কেন ভিজছে না!

● বন্ধুদের সঙ্গে এই মজার পরীক্ষাটা করতে পারো। কে কাগজটা না ভিজিয়ে গ্লাসটাকে জলের মধ্যে ডোবাতে পারবে!

বায়ুচাপ কী সর্বত্র সমান ?

পৃথিবীপৃষ্ঠে বা সমুদ্র সমতলে বায়ুচাপ সবথেকে বেশি হয়। কারণ সমুদ্র সমতলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল এবং উপরের স্তরের বায়ুর প্রবল চাপে বায়ুর অণুগুলো পরস্পরের কাছে চলে এসে বায়ুর ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। ফলে বায়ুর চাপও বেশি হয়।

আবার উপরের স্তরের বায়ুর অণুগুলি পরস্পরের থেকে দূরে চলে যাওয়ায় বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। এই কারণে **উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর চাপও কমতে থাকে।**

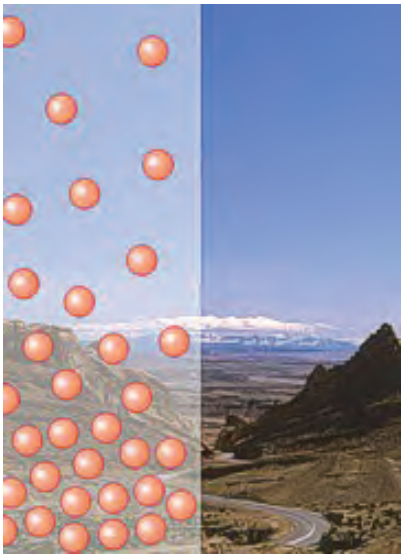

পিকলুর ডায়েরি

বায়ুর চাপ সর্বমুখী, অর্থাৎ বায়ু কোনো বস্তুর উপর সবদিক থেকে চাপ দেয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ ৭৬ সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান। বায়ুর চাপ মাপা হয় মিলিবার এককে (১ মিলিবার ০·০২৯৫৩ ইঞ্চি পারদস্তম্ভের চাপের সমান)। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুচাপ ১০১৩·২৫ মিলিবার।

বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র হলো ব্যারোমিটার। ১৬৪৩ সালে বিজ্ঞানী টরিসেলির আবিষ্কৃত সূত্র অনুসারে পারদ ব্যারোমিটার তৈরি হয়। এর মাধ্যমে বায়ু চাপের তারতম্য পরিমাপ করা যায়। একটা পারদভর্তি পাত্রে একটা এক মুখ বন্ধ পারদ ভর্তি কাচের নল উপুড় করে বসানো থাকে। বায়ুর স্বাভাবিক চাপে কাচ নলের মধ্যে প্রায় ৭৬ সেমি পারদ থাকে। বায়ুচাপ কমলে পারদ নেমে যায়। আর চাপ বাড়লে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়ে।

কী হবে দেখো !

একটা স্কেলকে টেবিলের কানায় এমন ভাবে রাখো যাতে স্কেলের বেশির ভাগ অংশ টেবিলের বাইরে বেরিয়ে থাকে। এবার স্কেলের বাইরের প্রান্তটায় একটু টোকা মারলেই স্কেলটা পড়ে যাবে।

এবার একটা খবরের কাগজ স্কেলের টেবিলের উপর থাকা অংশটার ওপর বিছিয়ে দিয়ে একটু চেপে দাও। তারপর টোকা মেরে দেখো কী হয়!

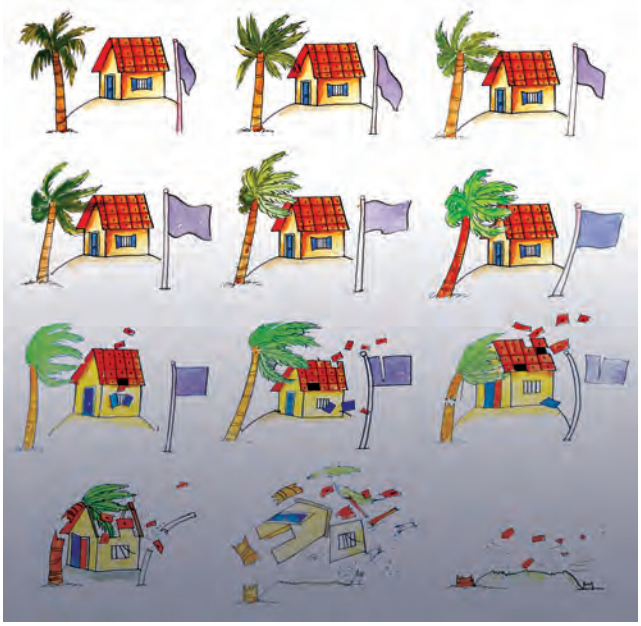

কী হয় দেখো!

একটা কিছুটা জলভরা প্লাস্টিকের বোতলের মুখটা ভালো করে পাতলা পলিথিন বা কর্কের ছিপি দিয়ে আটকে দাও। একটা সরু নল ছিপিটার মধ্যে দিয়ে বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। এবার নলটার মধ্যে দিয়ে বোতলের ভিতর জোরে কয়েকবার ফুঁ দাও।

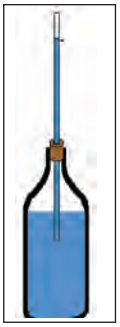

এবার আমরা দুটো গল্প পড়বো, তারপর দুটো প্রশ্ন। খুদে বিজ্ঞানীরা মগজাস্ত্র নিয়ে লেগে পড়ো।

আজ দিনটা ভীষণ গরম ছিল। সারাদিন খাঁ খাঁ রোদ। সৃজন স্কুল থেকে ফিরে বিকেলটা মাঠেই খেলে রোজ। কিন্তু আজ আর মা তাকে মাঠে যেতে দিলেন না। কারণ, আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, আশপাশটা কেমন থমথমে হয়ে আছে, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। হঠাৎ ঝড় উঠলো। জানালা দরজায় প্রচণ্ড জোরে বাতাস আছড়ে পড়তে থাকলো। বৃষ্টি শুরু হলো। বলোতো, ঝড় ওঠার আগে আশপাশটা এরকম থমথমে হয়ে থাকে। একটুও বাতাস বয় না।

পুজোর ছুটিতে ঝিনুক বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গেল গোমুখে। গঙ্গা নদীর উৎস গোমুখ তুষার গুহা, হিমালয় পর্বতের খুব উঁচুতে (প্রায় ৩৯০০ মিটার উঁচুতে) অবস্থিত। জায়গাটা খুব সুন্দর কিন্তু ঝিনুকের মন খারাপ। কারণ, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। চাল- ডাল কিছুই ভালো করে সিদ্ধ হচ্ছে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে এরকম অসুবিধা হয়। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম থাকার কারণে কম উষ্ণতায় জল ফুটতে শুরু করে।

বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণ

একটা পানীয় জলের প্লাস্টিকের বোতল কিছুটা প্রায় ফুটন্ত জল দিয়ে ভর্তি করে ঢাকনা আটকে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে বোতলটা তুবড়ে গেছে। কারণ বোতলে গরম জল ভরার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বাতাস গরম হয়ে কিছুটা বেরিয়ে গেছে। বাকি বাতাস ঠান্ডা হয়ে, সংকুচিত হয়ে ভিতরে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। তখন বাইরের বাতাসের চাপে বোতলটা তুবড়ে গেছে।

বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন হলে বায়ুর আয়তন, ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। যেমন- বায়ু উত্তপ্ত হলে বায়ুর অণুগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে উষ্ণ বায়ু হালকা হয়ে প্রসারিত হয় এবং ওপরে উঠে যায়। বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে অণুর সংখ্যাও কমে যায় এবং বায়ুর চাপও কমে যায়। বায়ু শীতল হলে সংকুচিত হয় এবং বায়ুর ঘনত্ব বেড়ে যায়। তাই বায়ুর চাপও বেড়ে যায়। একারণেই শীতল মেরু অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি এবং উষ্ণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম হয়।

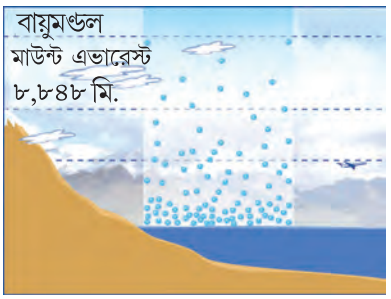

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং উপরের বায়ুর স্তরের প্রবল চাপে বায়ুর অণুগুলো ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বেশি পরিমাণে থাকে, আর যত উপরের দিকে যাওয়া যায় তত পরস্পর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ **ভূমির উচ্চতা** বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমে এবং বায়ুর চাপও কমে। প্রতি ১১০ মিটার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ১ সেমি পারদ স্তম্ভের সমান বায়ুচাপ কমতে থাকে। একারণেই উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমলে জল ১০০° সে.-এর কম উষ্ণতাতেই ফুটতে শুরু করে। তাই কোনো কিছু সিদ্ধ হতে অসুবিধা হয়।

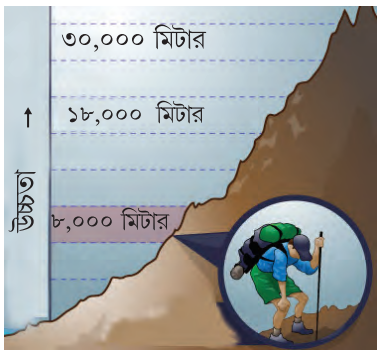

জানো কী?

উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে অথবা বেশি উচ্চতায় বাতাসের পরিমাণ কম হওয়ায়, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও এতো কমে যায় যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এ কারণেই পর্বতারোহীরা সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যান।

বায়ুতে **জলীয়বাষ্প** থাকলে, ঐ বায়ু জলীয়বাষ্পহীন বায়ুর থেকে হালকা হয়। তাই বায়ুর চাপও কম হয়। জলীয়বাষ্প বায়ুতে মিশলে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়, (অর্থাৎ বায়ুর চাপ কমে যায়) তার ফলেই

আবহাওয়া অশান্ত হয়ে ঝড়,বৃষ্টি, দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। আর জলীয়বাষ্পের অভাবে, বাতাস বেশি ভারী হওয়ার কারণে উচ্চচাপ তৈরি হয়।

◆ একটা লাট্টু বা বলকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তার গায়ে যদি ছোট্ট কাগজের বল ছুঁড়ে দাও, তাহলে কাগজের বলটা ছিটকে যাবে। ঠিক এভাবেই **পৃথিবীর আবর্তনগতির** জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাতাস বাইরের দিকে ছিটকে যায়। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে আবর্তন বেগ সবথেকে বেশি হয় বলে, এই অঞ্চলের বাতাস দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে ছিটকে যায়। এভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হয়। আর দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে তৈরি হয় উচ্চচাপ।

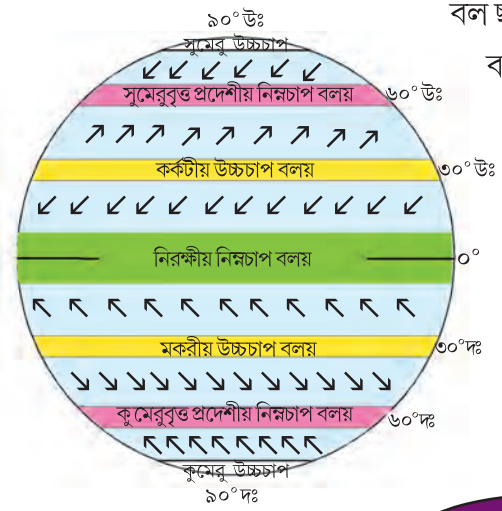

সমচাপ রেখা

পাশের ছবিটাতে আঁকাবাঁকা কালো কালো রেখাগুলো কী বলোতো? প্রতিদিন আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবহাওয়া মানচিত্রে দেখানো হয়। এই মানচিত্রে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান যেমন (উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত,বায়ুরচাপ, বায়ুর আর্দ্রতা) প্রভৃতি দেখানো হয়। আবহাওয়া মানচিত্রে বায়ুচাপ দেখানোর জন্য এই কালো আঁকাবাঁকা রেখা ব্যবহার করা হয়। এগুলি হলো সমচাপ রেখা।

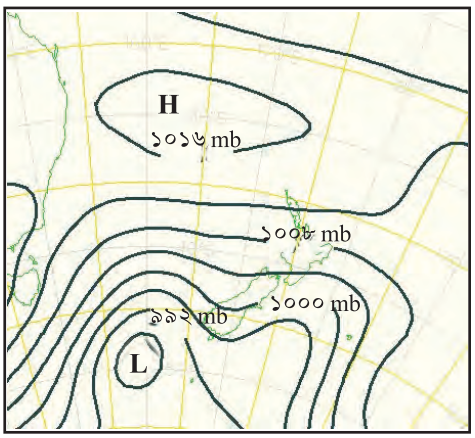

নির্দিষ্ট সময়ে একই পরিমাণ বায়ুচাপযুক্ত অঞ্চলগুলোকে মানচিত্রে যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়, তাকে সমচাপ রেখা বলে।

বৈশিষ্ট্য :

১. সমচাপ রেখায় বায়ুচাপকে মিলিবার (mb) এককে দেখানো হয়। পৃথিবীতে বায়ুচাপ সাধারণত ৯৮০ mb থেকে ১০৫০ mb দেখা গেছে।

২. সমচাপ রেখায় সাধারণত বায়ুচাপের পরিমাণগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুচাপের হিসাবে দেখানো হয়।

৩. সমচাপ রেখাগুলো পরস্পরকে স্পর্শ বা অতিক্রম করতে পারে না।

৪. সমচাপ রেখাগুলো যেখানে পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, সেই অঞ্চলে বায়ুর চাপের পার্থক্য বেশি।

বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ

সমচাপ রেখার ছবিটাতে লক্ষ করো কোথাও লেখা রয়েছে 'L' আবার কোথাও 'H' । যে সব স্থানের বায়ুর চাপ আশপাশের বায়ুচাপের থেকে বেশি, তাকে উচ্চচাপ অঞ্চল (High Pressure Area বা সংক্ষেপে 'H') বলে। আবার যেখানে বায়ুচাপ আশপাশের থেকে কম, তাকে নিম্নচাপ অঞ্চল (Low Pressure Area বা সংক্ষেপে 'L') বলে।

বায়ুর উচ্চচাপ

- যে সমস্ত অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা কম, অর্থাৎ পৃথিবীর শীতল অঞ্চলগুলোতে বায়ুর উচ্চচাপ দেখা যায়। যেমন-শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, মেরু অঞ্চল।
- উচ্চচাপের বায়ু শীতল হওয়ায় বায়ু সংকুচিত হয়
- বায়ুর নিমজ্জন এর কারণেও বায়ুর উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শীতল অঞ্চলে বাতাস ঠান্ডা ও ভারী হয়ে ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসে। এভাবে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু বেশি ঘন হয়, তাই চাপও বাড়ে।
- শীতল ও ভারী বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। একারণে উচ্চচাপ অঞ্চলে সাধারণত মেঘ, বৃষ্টি কিছুই হয় না। পরিষ্কার ও শান্ত আবহাওয়া থাকে।

বায়ুর নিম্নচাপ

- যে সমস্ত অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা বেশি অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে বায়ুর নিম্নচাপ দেখা যায়। যেমন- নিরক্ষীয় অঞ্চল, ক্রান্তীয় অঞ্চল।
- নিম্নচাপের বায়ু উষ্ণ হওয়ায় বায়ু প্রসারিত ও হালকা হয় ।
- বায়ুর ঊর্ধ্বগমনের কারণেও বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়, তাই বায়ু চাপও কমে।
- উষ্ণ বায়ু উপরের স্তরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এলে, বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জল বা বরফকণায় পরিণত হয়। এ কারণে নিম্নচাপ অঞ্চলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, অশান্ত আবহাওয়া দেখা যায়।

বাতাস বয়ে যায়——

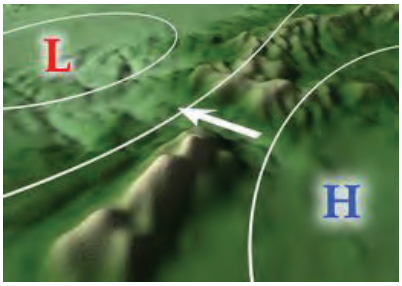

এক গ্লাস জল টেবিলের উপর ঢেলে দিলে কী হবে? জল উঁচু থেকে নিচু জায়গার দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করবে।

এইভাবেই, বায়ুও উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুর চাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের প্রধান কারণ। আবার বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমেই পৃথিবীতে উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ অঞ্চলের মধ্যে বায়ুচাপের সমতা বা ভারসাম্য বজায় থাকে। বায়ুচাপের পার্থক্য যত বেশি হয়, অর্থাৎ নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুচাপ যত বেশি কমে যায়, বায়ুচাপ সমান করার জন্য আশেপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু তত বেশি গতিবেগে ঐ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে। প্রবল বেগে ছুটে আসা বাতাস বিধ্বংসী রূপ নিলে, তাকে সাইক্লোন,টাইফুন, হ্যারিকেন, টর্নেডো প্রভৃতি বলা হয়।

ঘূর্ণবাতের উপগ্রহ চিত্র

হাতে কলমে

মাউন্ট এভারেস্ট

- উচ্চতা– ৮৮৪৮ মি.
- উষ্ণতা— -৯° সে.
- বায়ুচাপ— ৯৩০ মিলিবার

পুরীর সমুদ্রসৈকত

- উচ্চতা— ০ মিটার
- উষ্ণতা— ২০° সে.
- বায়ুচাপ– ১০০০মিলিবার

☛ এই দুটো জায়গার আবহাওয়া কেমন হতে পারে? পুরীর সমুদ্রসৈকত থেকে মাউন্ট এভারেস্ট গেলে, রোজকার জীবনে কীরকম পরিবর্তন হবে?

☛ সাম্প্রতিককালে, তোমার জেলায়, রাজ্যে বা দেশে ঘটে যাওয়া কোনো ঝড় বা সাইক্লোনের ছবি এবং লেখা সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করে কোলাজ বানিয়ে তোমার খাতায় আটকে ক্লাসে সবাইকে দেখাতে পারো।

৪ ভূমিরূপ

'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে কলকাতায়। হাসান শেখ, সোহা মুর্মু, বরুণ তামাং, এলিনা রায়—আরও কত সব নাম। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের অঞ্চলের ছবি এঁকেছে।

বরুণের ছবি

সোহার ছবি

এলিনার ছবি

☞ তোমার বাড়ির আশপাশের অঞ্চলটা কি এই ছবিগুলোর কোনোটার মতো ?

আমাদের এই পৃথিবীর উপরটা (ভূপৃষ্ঠ) সব জায়গায় একইরকম নয়। কোথাও উঁচু, কোথাও ঢেউ খেলানো আবার কোথাও বা নীচু সমতল। পৃথিবীপৃষ্ঠের ভূমির এই বৈচিত্র্যই হলো 'ভূমিরূপ' (**Landform**)।

একটা মজার খেলা

—ছবিগুলো দেখে খিদে খিদে পাচ্ছে? কিন্তু **মজার খেলাটা** খেলতে হবে তো!

১. একটা চৌকো কাগজকে উপরের দিকটা ভাঁজ করে তিনকোণা করো।

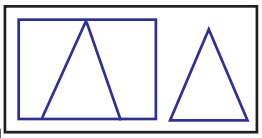

● লক্ষ করো উপরের দিকটা কেমন উঁচু আর ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে।

২. এবার এই তিনকোণা কাগজটার উপরের সরু অংশটা একটু ভাঁজ করে নাও।

● এবার দেখো উপরের উঁচু সরু অংশটা আর নেই। বরং চ্যাপ্টা, নিচু হয়ে গেছে।

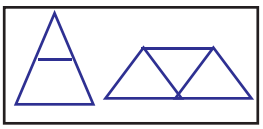

৩. আরও একবার কাগজের উপরের দিকটাকে ভাঁজ করে দেখো।

● এবার উপরের দিকটা কেমন সমতল আর আরও নিচু হয়ে গেছে!

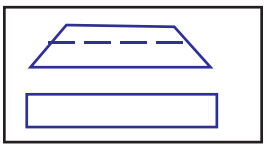

উচ্চতা, গঠন এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রধানত তিনরকম ভূমিরূপ দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠের সব থেকে উঁচু অংশ হলো **পর্বত**, মাঝারি উঁচু অংশ **মালভূমি**। আর সব থেকে নীচু, প্রায় সমতল অংশ **সমভূমি**।

ভূপৃষ্ঠের সবজায়গা এক রকম নয় কেন ?

● পৃথিবীর ওপর কোথাও পাহাড়, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও সমভূমি। এই সমস্ত রকম ভূমিরূপ মূলত দুরকম শক্তির দ্বারা তৈরি হয়েছে। একটা হলো পৃথিবীর **ভিতরকার শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি**। আর অন্যটা **বাইরের শক্তি বা বহির্জাত শক্তি**।

☛ জানো কি, তুমি যে ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছো, সেটা স্থির নয়! ভূঅভ্যন্তরে সারাক্ষণই আলোড়ন হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ অনেকগুলো ছোটো, বড়ো পাত নিয়ে গঠিত (চায়ের প্লেট ভাঙলে যেরকম টুকরো হয়ে যায়, ঠিক সেরকম)। মহাদেশ এবং মহাসাগরগুলো এই পাতগুলোর উপরে আছে। আর পাতগুলো একটা থকথকে (সান্দ্র) স্তরের(অ্যাসথেনোস্ফিয়ার) ওপর ভাসছে। ভাসতে ভাসতে পাতগুলো কখনো পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে ধাক্কা খায়, আবার কখনো দূরে সরে যায়, তখন ভূ-আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এটাই পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি। এর ফলে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি সবরকম ভূমিরূপ তৈরি হয়। আর বাইরের শক্তি হলো নদী, বায়ু, হিমবাহ, সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি। এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ভূমিরূপ-এর ওপর সবসময় কাজ করে কখনও ক্ষয় করে উচ্চতা কমিয়ে দেয়, আবার কোথাও সঞ্চয় করে ভূমিরূপ এর বৈচিত্র্য তৈরি করে।

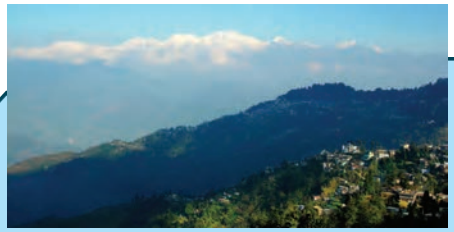

☛ আঁকা প্রতিযোগিতার দিন বরুণ তামাং বলছিল ‘আমাদের দার্জিলিং খুব সুন্দর—চারদিকে কত উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া, কয়েকটা এত উঁচু যে মেঘে ঢাকা থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় তো বরফ জমে থাকে। আর কি প্রচণ্ড ঠান্ডা—দিনের বেলাতেও সোয়েটার পরে থাকতে হয়!’

● পৃথিবীজুড়ে পর্বতের উচ্চতা এবং আকৃতির অনেক বৈচিত্র্য আছে। এর কারণ পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং সময়ের পার্থক্য। একারণেই হিমালয়, আল্পস ইত্যাদি নবীন পর্বতগুলো অনেক উঁচু এবং সূঁচালো চূড়াযুক্ত হয়। অন্য দিকে আরাবল্লীর মতো প্রাচীন পর্বতগুলো বহু বছর ধরে ক্ষয়ের ফলে উচ্চতা কমে যাওয়ায় চূড়াগুলো তেমন সূঁচালো নয়। উৎপত্তি অনুযায়ী পর্বত প্রধানত তিন ধরনের হয়।

এশিয়া মহাদেশের হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর

আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা-সবই **ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain)**।

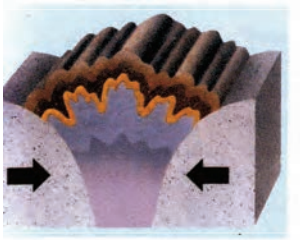

কীভাবে সৃষ্টি হলো ভঙ্গিল পর্বত?

নিজেই বানিয়ে ফেলো ভঙ্গিল পর্বত! প্রথমে একটি মাদুর বিছিয়ে দাও। এবার মাদুরের দুধারে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মাঝখানের দিকে ঠেলতে শুরু করো। লক্ষ করো মাদুরটা ক্রমশ ভাঁজ হয়ে ওপরের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে। কার্পেট নিয়েও পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার হাত দুটো ভাসমান পাত। ঠিক এইভাবেই পাতদুটোর প্রবল চাপে মাঝখানের ভূ-ভাগ ভাঁজ খেয়ে উঁচু হয়ে উঠে ভঙ্গিল পর্বত এর সৃষ্টি হয়।

❍ আর একধরনের পর্বত হলো **স্তূপ পর্বত (Block Mountain)**। ভূ- আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠে অনেক সময় ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটলগুলোর মাঝের ভূখণ্ড উঁচু হয়ে অথবা দুপাশের ভূখণ্ড নীচে বসে গিয়ে মাঝখানের ভূখণ্ড স্তূপ এর মতো পর্বত সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এবং ফ্রান্সের ভোজ এরকম স্তূপ পর্বত।

❍ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর লাভা, ছাই, ছোটো ছোটো পাথর বেরিয়ে এসে আগ্নেয়গিরির চারদিকে জমা হয়ে তিনকোণা শঙ্কুর মতো একরকমের পর্বত সৃষ্টি হয় যাকে বলে **আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain)**। ইতালির ভিসুভিয়াস, এটনা, আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো, জাপানের ফুজিয়ামা, ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া এরকম আগ্নেয় পর্বত।

- সাধারণত ৯০০ মিটারের বেশি উঁচু, অনেকদূর বিস্তৃত, শিলা দ্বারা গঠিত ভূমিরূপই হলো **পর্বত (Mountain)**।
- পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পর্বতময়।
- পর্বতের বেশিরভাগ অংশই খাড়া ঢালযুক্ত আর খুব উঁচু-নিচু হয়।
- পর্বতের উপরের দিকের সরু, সূঁচালো অংশটা হলো **পর্বতশৃঙ্গ** বা **চূড়া**। হিমালয় পর্বতের মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মিটার উঁচু) পৃথিবীর সবথেকে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ।
- দুটো পর্বতচূড়ার মাঝখানের নিচু খাতের মতো অংশটা হলো **পর্বত উপত্যকা**।
- এরকম অনেকগুলো পর্বত শৃঙ্গ আর উপত্যকা বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করলে **পর্বতশ্রেণি** তৈরি হয়।
- এরকম অনেকগুলো পর্বতশ্রেণি বিভিন্ন দিক থেকে এক জায়গায় এসে মিশলে, **পর্বতগ্রন্থি** তৈরি হয়।

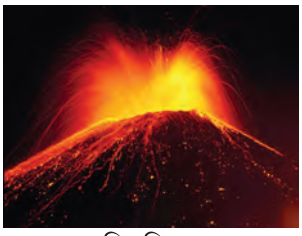
ভিসুভিয়াস

মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো

দু-দিক মিলছে না! মিলিয়ে লেখো

➲ এটনা	ভঙ্গিল পর্বত
➲ আল্পস	আগ্নেয় পর্বত
➲ ব্ল্যাকফরেস্ট	ভঙ্গিল পর্বত
➲ হিমালয়	স্তূপ পর্বত

সোহার বাড়ি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে। ওখানকার লাল, কাঁকর বিছানো মাটি, উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো পাথুরে জমি, শাল-পলাশ-মহুয়ার বন, কোপাই নদীর জলে সূর্যের অস্ত যাওয়া- এসবই ওর ভীষণ প্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলো—বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ মালভূমি অঞ্চল।

☞ উৎপত্তি আর অবস্থান অনুসারে মালভূমির আকৃতি, প্রকৃতিরও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে।

- **পর্বতবেষ্টিত মালভূমি (Intermontane Plateau)** গুলো সবথেকে উঁচু আর বিস্তৃত হয়। হিমালয় এবং কুয়েনলুন পর্বত শ্রেণির মধ্যে অবস্থিত **তিব্বত মালভূমি** (৩,৬৫৫ মিটার উঁচু) পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমি।

- দঃ আফ্রিকা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, আন্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড-এর বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে **মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau)**।
- অগ্ন্যুৎপাতের সময় গরম লাভা বেরিয়ে এসে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে বিরাট মালভূমি সৃষ্টি করে। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি, মালব মালভূমি এরকম **লাভাগঠিত মালভূমি (Volcanic Plateau)**।

- নদী উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন মালভূমি হলো **ব্যবচ্ছিন্ন**

- আশপাশের অঞ্চলের সাপেক্ষে হঠাৎ উঁচু (সাধারণত ৩০০ মিটারের বেশি উঁচু) বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যার চারিদিকে খাড়া ঢাল আছে, এরকম ভূমিরূপ হলো **মালভূমি (Plateau)**।
- স্থলভাগের বেশিরভাগ জায়গা জুড়েই রয়েছে মালভূমি। এশিয়া, আফ্রিকা, উঃ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই বড়ো বড়ো মালভূমি আছে।
- মালভূমির উপরটা সমতল, ঢেউ খেলানো থেকে উঁচু-নীচুও হতে পারে।
- মালভূমি অনেকটা তোমার পড়ার টেবিলের মতো। উপরটা টেবিলের মতোই প্রায় সমতল হলেও, ধারগুলো টেবিলের পায়ার মতোই ঢালু এবং খাড়া। এজন্য মালভূমিকে '**টেবিল ল্যান্ড**' বলে।

মালভূমি (Dissected Plateau)। ছোটোনাগপুর মালভূমি এই ধরনের। পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল ছোটোনাপুরের অংশ। মালভূমির গড় উচ্চতা ৩০০ মিটার হলেও, কিছু উঁচু মালভূমির উচ্চতা অনেক বেশি।

ছোটোনাগপুর মালভূমি

পামীর মালভূমি (৪,৮৭৩ মিটার উঁচু) পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি বলে একে '**পৃথিবীর ছাদ**' বলা হয়। তিব্বত মালভূমি, ভারতের লাডাক মালভূমি সবই উচ্চ মালভূমি।

এলিনা কলকাতার মেয়ে। তোমরা যারা কলকাতা বা আশেপাশের জেলাগুলোতে থাকো, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো এখানকার ভূমি আদৌ উঁচুনীচু নয়, বরং অনেক বেশি সমতল।

☞ পৃথিবীর ভিতরকার শক্তি এবং বাইরের প্রাকৃতিক শক্তি দু-ধরনের প্রভাবেই অনেক ধরনের সমভূমি সৃষ্টি হয়।

- নদী, সমুদ্র, হ্রদে দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে **পলিগঠিত সমভূমি (Alluvial Plain)** সৃষ্টি হয়। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি এরকম স.মভূমি।

- আগ্নেয়গিরির লাভা জমে **লাভা সমভূমি (Lava Plain)** তৈরি হয়। আইসল্যান্ডে এই ধরনের সমভূমি দেখা যায়।

- মরুভূমির বালি বহুদূরে উড়ে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে তৈরি হয় **লোয়েস সমভূমি (Loess Plain)**।

- কোনো নীচু, সমতল, বিস্তীর্ণ ভূমিরূপ হলো **সমভূমি (Plain)**।
- প্রায় প্রতিটি মহাদেশেই বিস্তীর্ণ সমভূমি আছে। এশিয়ার গাঙ্গেয় সমভূমি, আফ্রিকার নীলনদের সমভূমি, উঃ আমেরিকার প্রেইরি, দঃ আমেরিকার পম্পাস পৃথিবীর বিখ্যাত সমভূমি অঞ্চল।
- সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব বেশি উঁচু হয় না (৩০০ মিটারের কম হয়)।
- সমভূমির উপরিভাগ সমতল বা সামান্য ঢেউ খেলানো হয়।
- পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। একারণে এই উর্বর সমতল ভূভাগগুলোতে সব থেকে বেশি মানুষ বাস করে।

‘মগজাস্ত্র’ -ধরতে পারলেই লিখতে পারবে !

পর্বত	মালভূমি	সমভূমি
উচ্চতা ----------	উচ্চতা ----------	উচ্চতা ৩০০ মিটারের কম।
বৈশিষ্ট্য----------	চারি দিকে খাড়া ঢাল আছে	বৈশিষ্ট্য ----------
মাউন্ট এভারেস্ট সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	সর্বোচ্চ মালভূমি --------- ----------	গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি- বৃহত্তম ব-দ্বীপ সমভূমি।
বৈশিষ্ট্য—---------- ----------	বৈশিষ্ট্য—---------- ----------—--------	উপরিভাগ সমতল বা সামান্য ঢেউ খেলানো হতে পারে।
প্রকারভেদ ---------- ----------	লাভা গঠিত মালভূমি, পর্বতবেষ্টিত মালভূমি।	প্রকারভেদ ---------- ----------
আল্পস, আন্দিজ, ফুজিয়ামা, এটনা	উদাহরণ ----------	উদাহরণ ----------

❒ পর্বত-মালভূমি-সমভূমি— আমাদের জীবনে প্রভাব কতখানি !

ভূমিরূপের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভূমির প্রকৃতি যেখানে যেমন-— মানুষ সেরকমভাবেই মানানসই জীবনযাত্রা গড়ে তোলে। ভূমি মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারক এবং নিয়ন্ত্রক।

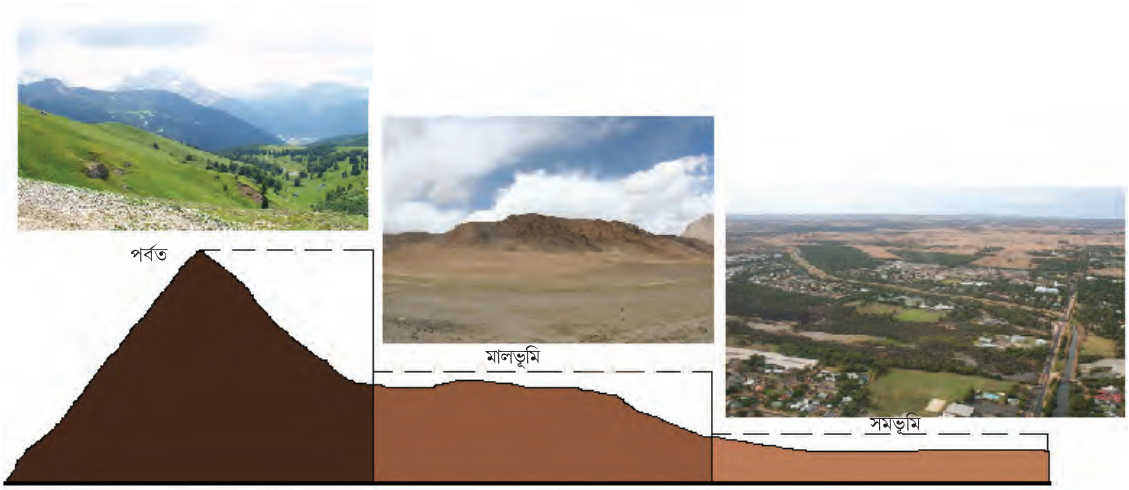

আমাদের জীবনে ভূমিরূপের প্রভাব

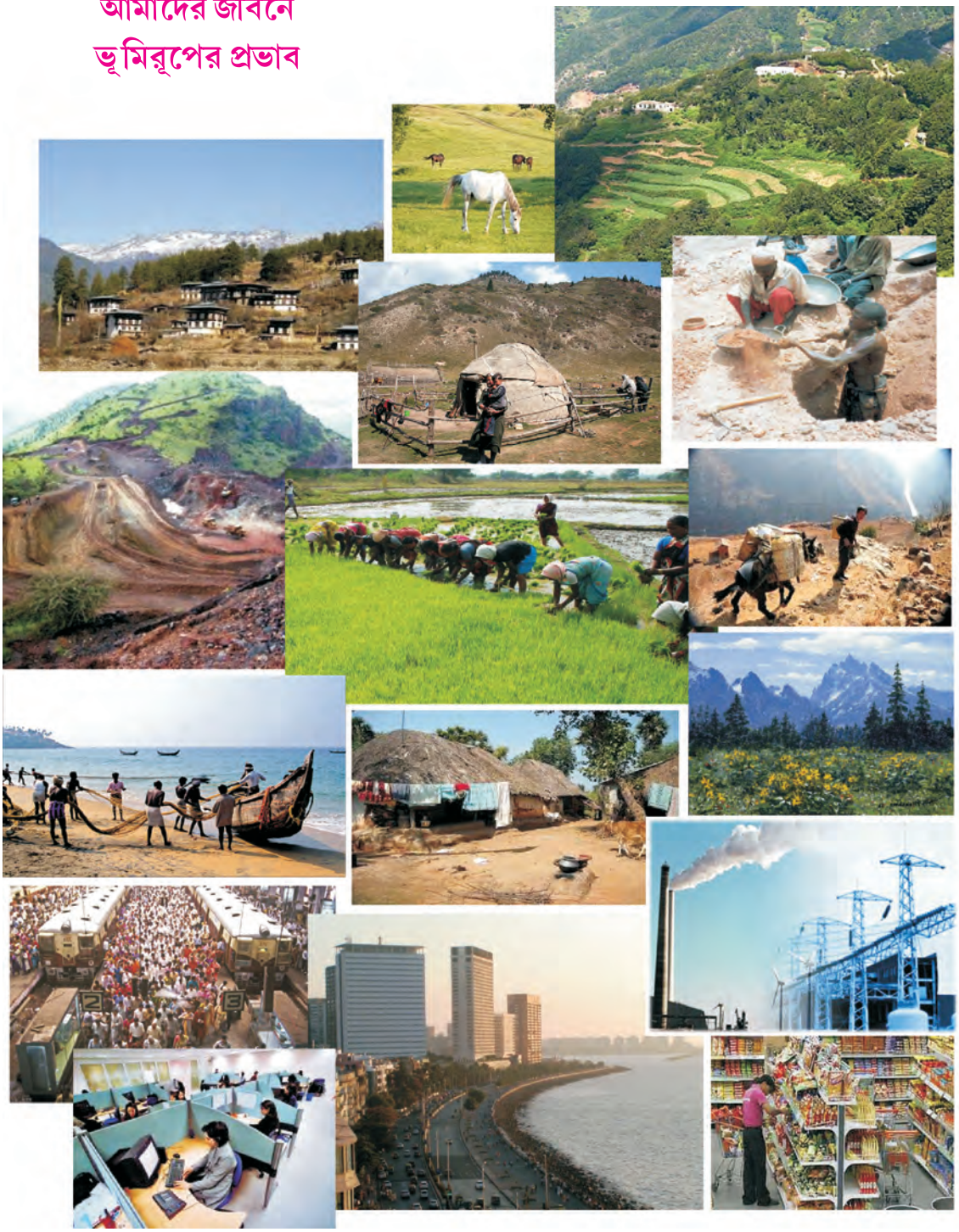

- উঁচু পর্বতের বরফ-গলা জল থেকে প্রচুর নদী সৃষ্টি হয়। এই নদীগুলো থেকে সারাবছর জল পাওয়া যায়। যেমন হিমালয় পর্বত থেকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
- জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস পর্বতে বাধা পেয়ে বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে দঃ পঃ মৌসুমি বায়ু ভারতে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
- পর্বত বিরাট প্রাচীরের মতো উষ্ণ এবং শীতল বায়ুপ্রবাহকে আটকাতে পারে। শীতকালে সাইবেরিয়ার তীব্র ঠান্ডা বাতাসকে বাধা দিয়ে হিমালয় ভারতে শীতের তীব্রতা কমিয়ে দেয়।
- পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত মূল্যবান নরম কাঠের বনভূমি গড়ে ওঠে।
- পর্বতের ঢালগুলোয় ভালো পশুচারণ ক্ষেত্র পাওয়া যায়। পর্বতের ঢালে ধাপ কেটে চাষবাসও করা যায়।
- পার্বত্য অঞ্চলের খরস্রোতা নদীগুলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক।
- কিছু কিছু পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পর্বতের শিলা, বড়ো ছোটো পাথর—সবই ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঠান্ডা আরামদায়ক আবহাওয়ার জন্য ভালো পর্যটনক্ষেত্র গড়ে ওঠে। যেমন—দার্জিলিং, উটি, সিমলা।

- বেশিরভাগ বড়ো বড়ো মালভূমিগুলোর প্রায় সবই শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্য বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ব্যাপকভাবে পশুচারণ করার অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যায়।
- বেশিরভাগ মালভূমি অঞ্চল প্রচুর পরিমাণে খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ।

- মালভূমি অঞ্চলের রুক্ষ মাটি এবং প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে খুব কম পরিমাণে চাষবাস করা যায়।

- পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি নদ-নদীর পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হওয়ায়, সমভূমি অঞ্চলগুলোই পৃথিবীর সবথেকে উর্বর অঞ্চল।
- একাধিক নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা এই সমভূমিগুলোতেই গড়ে উঠেছিল।
- বর্তমানেও বেশিরভাগ শহর, নগর, জনপদ সবই সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ উর্বর সমতলভূমি থাকায়, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুরই সুবিধা পাওয়া যায়। এইজন্য সমভূমি অঞ্চলগুলো পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল।

খুদে গোয়েন্দারা আগে দেওয়া তথ্যগুলো আসলে এক একটা সূত্র। প্রথমে খুব বিচক্ষণভাবে পড়ে বুঝে নাও। তারপর বিশ্লেষণ করে অনুমান করতে হবে কোথায়, কী হতে পারে আর কোনটা হতে পারে না। এরপর ঠিক বক্সগুলোতে '√' চিহ্ন দিয়ে দাও!

জনজীবনে ভূমিরূপের প্রভাব

মগজাস্ত্র!

মানুষের জীবন	পার্বত্য অঞ্চলে	মালভূমি অঞ্চলে	সমভূমি অঞ্চলে
প্রধান জীবিকা কী কী হতে পারে?	কৃষিকাজ ☐ ব্যবসা ☐ পরিবহণ ☐ পশুপালন ☐ পর্যটন শিল্প ☐ ভারী শিল্প ☐ কাঠ শিল্প ☐ খনিজ উত্তোলন ☐ বিনোদন শিল্প ☐	কৃষিকাজ ☐ পশুপালন ☐ ব্যবসা ☐ শিল্প ☐ খনিজ উত্তোলন ☐ ভারী শিল্প ☐ কাঠ শিল্প ☐ পর্যটন, বিনোদন শিল্প ☐ পরিবহণ শিল্প ☐	কৃষিকাজ ☐ শিল্প ☐ ব্যবসা ☐ পশুপালন ☐ পরিবহণ ☐ খনিজ উত্তোলন ☐ পর্যটন, বিনোদন শিল্প ☐
যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত?	খুব ভালো ☐ ভালো ☐ ভালো নয় ☐	খুব ভালো ☐ ভালো ☐ মাঝারি ☐ ভালো নয় ☐	খুব ভালো ☐ ভালো ☐ মাঝারি ☐ ভালো নয় ☐
জনবসতি ও জনঘনত্ব কেমন হতে পারে?	খুব বেশি ☐ বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐	খুব বেশি ☐ বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐	খুব বেশি ☐ বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐
অর্থনৈতিক উন্নতি কেমন হতে পারে?	বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐	বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐	বেশি ☐ মাঝারি ☐ কম ☐
জীবনযাত্রা	কষ্টকর ☐ সহজ ☐	কষ্টকর ☐ সহজ ☐	কষ্টকর ☐ সহজ ☐

☞ **এবার তোমার নিজের অঞ্চলের একটা সমীক্ষা করে ফেলো।**

১. তোমার অঞ্চলটার ভূ-প্রকৃতি— সমতল ☐ ঢেউ খেলানো ☐ খুবই উঁচু নীচু ☐

২. ভূমির ঢাল কেমন—ঢাল প্রায় নেই ☐ মাঝারি ঢাল ☐ খাড়া ঢাল ☐

৩. কাছাকাছি কোনো পাহাড় বা পর্বত আছে?— হ্যাঁ ☐ না ☐

৪. কাছাকাছি কোনো ছোটো বা বড়ো নদী আছে?— হ্যাঁ ☐ না ☐
নদীর নাম.....

৫. কাছাকাছি কোনো ঝরনা, জলাধার, বাঁধ আছে?— হ্যাঁ ☐ না ☐
নাম.....

৬. আশেপাশে কোনো বড়ো বনভূমি বা জঙ্গল আছে?— হ্যাঁ ☐ না ☐
নাম.....

৭. অঞ্চলটাকে কী মনে হয়?— পার্বত্য অঞ্চল ☐ মালভূমি অঞ্চল ☐ সমভূমি অঞ্চল ☐

৮. মানুষের প্রধান জীবিকা কী?

.....

৯. কাছাকাছি কোনো বড়ো পাকা রাস্তা, রেললাইন আছে?

.....

১০. পাকা রাস্তা বা রেললাইন থেকে তোমার বাড়িটা কতটা দূরে—

.....

১১. কাছাকাছি কোনো স্কুল, হাসপাতাল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, রেলস্টেশন থাকলে তা তোমার বাড়ি থেকে কতটা দূরে আছে?

.....

১২. তোমার বাড়ি এবং আশেপাশের বাড়িগুলো— পাকা ☐ কাঁচা ☐

১৩. বাড়িগুলো ঘনঘন ☐ ফাঁকা-ফাঁকা ☐

১৪. জায়গাটা গ্রাম ☐ শহর ☐ মফস্‌সল ☐।

মজার খেলা—শব্দ সন্ধান

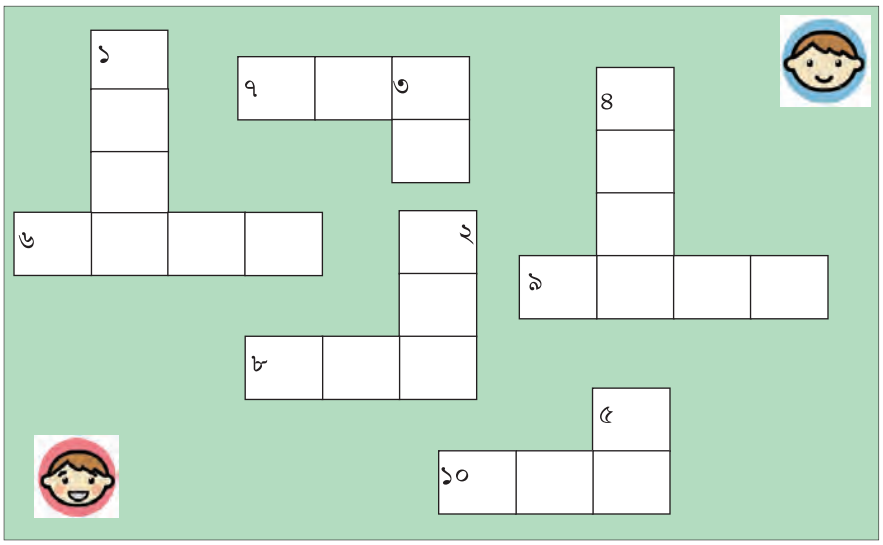

উপর-নীচ

১. জাপানের একটা আগ্নেয় পর্বত।

২. দক্ষিণ আমেরিকার সমভূমি।

৩. আমেরিকার ভঙ্গিল পর্বত।

৪. ভারতের একটা স্তূপ পর্বত।

৫. ফ্রান্সের একটা স্তূপ পর্বত।

পাশাপাশি

৬. এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বত।

৭. ‘পৃথিবীর ছাদ’।

৮. ইউরোপের ভঙ্গিল পর্বত।

৯. ভারতের প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত।

১০. দক্ষিণ আমেরিকার ভঙ্গিল পর্বত।

৫ নদী

পাহাড়ের মাথায় একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে আছে ‘হৈ’। চারদিকে ঘন সবুজ পাইনের বন... নীচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে সে।

হঠাৎ লাফাতে লাফাতে ‘চৈ’ এসে বলল—‘ওহে ভাবুক, কী এত দেখছো?’

—দূরে ঐ উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলা নদীটাকে।— নদী? ওখানে অত বড়ো নদী এল কোথা থেকে? —‘হৈ’ বলল- এই পাহাড় থেকে যে ছোটো জলধারাটা বয়ে চলেছে, সেটা ওই নদীতে গিয়ে মিশেছে।..... সব নদীই এরকম ছোটো জলধারা থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে অনেকগুলো জলধারা একসঙ্গে মিশে একটা বড়ো জলধারা বা ‘নদী’ তৈরি হয়।

—‘চৈ’-এর ঠিক বিশ্বাস হলো না, সে আরও অস্থির হয়ে বলল—‘আমি দেখব কোথায় জলধারা গুলো মেশে---কীভাবে নদী তৈরি হয়’।

তারপর মহা উৎসাহে ‘হৈ’ আর ‘চৈ’ ঐ জলধারার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো, এভাবে চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো—একজায়গায় জলের তীব্র আওয়াজে থামল ‘চৈ’। দেখল-আরেকটা জলধারা এসে পড়েছে তাদের জলধারাটায়।

এরকম অনেকগুলো জলধারা পেরিয়ে প্রায় সন্ধের মুখে একটা সমতল জায়গায় এসে থামল তারা, বুঝল—এটাই পাহাড়ের নীচের সেই উপত্যকাটা! কিছু দূরেই জলের বিরাট গর্জন শোনা যাচ্ছে—আশপাশের পাহাড় থেকে অনেকগুলো জলধারা এসে তৈরি করেছে বিরাট এক জলধারা!

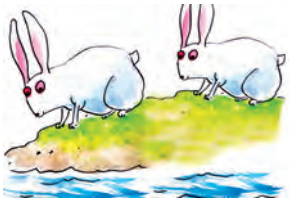

—‘নদী !নদী !’—উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ‘চৈ’।

প্রবলবেগে সেই নদী বয়ে চলেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আরও নীচু অঞ্চলের দিকে।—হয়তো কোনো সমুদ্রের দিকে-----

গল্পটা নদীর সৃষ্টির গল্প। সহজে বললে—পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত ছোটো ছোটো জলধারাগুলো যখন পরস্পর মিলিত হয়ে ভূমির ঢাল অনুসারে উঁচু থেকে নীচু স্থানের দিকে বয়ে চলে, তখন নদীর সৃষ্টি হয়।

● নদী যেখানে সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাকে নদীর **উৎস (Source)** বলে। সাধারণত পাহাড়-পর্বত বা মালভূমির মতো কোনো উঁচু জায়গায় নদীর উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহের 'গোমুখ' থেকে ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে।

গোমুখ

● যেখানে গিয়ে নদী শেষ হয়, অর্থাৎ নদী কোনো সাগর-উপসাগর, হ্রদ, জলাশয় বা অন্য কোনো নদীতে গিয়ে মেশে, সেই জায়গাকে নদীর **মোহনা(Mouth)** বলে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা নদীর মোহনা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী

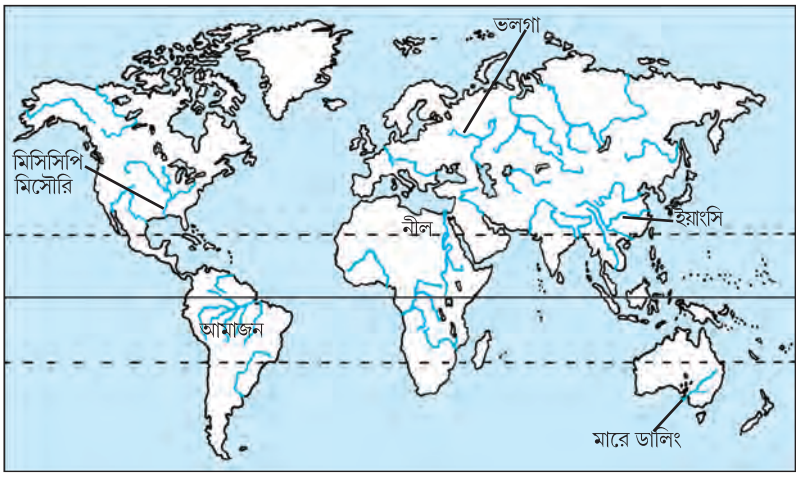

নদী হলো স্বাভাবিক প্রবহমান জলধারা, যা অভিকর্ষের টানে ভূমির ঢাল অনুসারে উৎস থেকে মোহনার দিকে বয়ে চলে।

নদীগুলো কতটা লম্বা? এঁকে ফেলতে পারো!!

বড়ো সংখ্যাকে ছোটো করে নিলে আঁকতে সুবিধা হবে। প্রথমে সব দৈর্ঘ্যগুলো এক হাজার দিয়ে ভাগ করে ফেলো। তারপর ভাগফলগুলোকে সেমি. ধরে, একটা স্কেলের সেন্টিমিটারের দাগ অনুযায়ী লম্বা করে লাইন এঁকে ফেলো। প্রতিটা নদীর জন্য একটা করে লাইন টানতে হবে। যেমন ৬৩০০ কিলোমিটারকে ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৬.৩ । একে সেন্টিমিটার ধরে নিয়ে খাতায় একটা ৬.৩ সেন্টিমিটার লম্বা লাইন এঁকে ফেলো। প্রতিটা নদীর জন্য টানা লাইনগুলোর পাশে নদীর নামগুলো লিখে ফেলো। দেখোতো কোন নদী কত লম্বা তা এক নজরেই বোঝা গেলো কিনা!

পৃথিবীর প্রধান নদীগুলোর নাম (দৈর্ঘ্য অনুসারে)	কোন মহাদেশে অবস্থিত	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১. নীল	আফ্রিকা	৬,৬৫০
২. আমাজন	দ:আমেরিকা	৬,৩০০
৩. ইয়াংসিকিয়াং	এশিয়া	৫,৫৩০
৪. মিসিসিপি	উ:আমেরিকা	৪,০৯০
৫. মিসৌরি	উ:আমেরিকা	৩,৭৭০
৬. মারে ডার্লিং	ওশিয়ানিয়া	৩,৭২০
৭. ভলগা	ইউরোপ	৩,৭০০

শব্দগুলো 'কঠিন' ! সহজ করে বুঝে নাও

● **ধারণ অববাহিকা (Catchment Basin)** তোমরা 'হৈ' আর 'চৈ'-এর যে গল্পটা পড়লে, ওটা আসলে নদীর 'ধারণ অববাহিকারই' গল্প। পর্বতের বরফগলা জল বা বৃষ্টির জল অসংখ্য ছোটো ছোটো জলধারার মাধ্যমে বয়ে বড়ো নদী তৈরি করে। এই জলধারা সহ মূল নদীটি যে বিরাট অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই অঞ্চলটাই হলো ওই নদীর ধারণ অববাহিকা।

● **জলবিভাজিকা (Watershed)**

তোমার ভূগোল বইটার মাঝের পাতাটা খোলো, তারপর খোলা অবস্থায় বইটা উল্টে দাও। ভেবে দেখো, যদি মাঝখানের উঁচু শিরার মতো অংশটায় জল পড়ে, তাহলে কী হবে?

জলটা উঁচু অংশটা থেকে দু-দিকে ঢাল বরাবর গড়িয়ে যাবে, তাই তো?

ঠিক এইভাবে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে যখন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল বরাবর বিভিন্নদিকে বয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো পাহাড়ের চূড়ার অংশটা বৃষ্টির জলকে বিভিন্ন দিকে ভাগ করে বা 'বিভাজন' করে, তাই তাকে **'জলবিভাজিকা'** বলে। জলবিভাজিকার বিভিন্ন দিকে বয়ে যাওয়া জল, একাধিক ছোটো ছোটো জলধারার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে, মিলিত হয়ে মূল নদী তৈরি করে।

'হৈ-চৈ'-এর গল্পে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছো অনেকগুলো ছোটো ছোটো জলধারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা বড়ো নদী তৈরি করেছে। ঐ ছোটো ছোটো জলধারাগুলো মূল নদীটার **উপনদী**।

দেখো কী হয় !

বাড়ির উঠোনে, পার্কে বা স্কুলের মাঠে, ঢালু জায়গায় জল ঢেলে দিয়ে দেখো, ভূমির ঢাল কোন দিকে । জল উঁচু থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে,ঢালের উপরের দিকে এবার পাশাপাশি (৬ ইঞ্চি ব্যবধানে) কিন্তু একটু উপরে-নীচে তিনটি বিন্দু 'ক', 'খ', 'গ' চিহ্নিত করো। এরপর তিনটি বিন্দুতে জল ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখো তিনটে জলধারা ঠিক কীভাবে উঁচু থেকে নীচুর দিকে গড়িয়ে যায়।

আরও একটা বিন্দু 'ঘ' নাও। 'ঘ' এর সামনে একফুট দূরে একটা বড়ো ইট বা বড়ো পাথর রেখে দাও, এবার 'ঘ' বিন্দুতে জল ঢেলে দেখো জলধারাটা কীভাবে গড়িয়ে যায়।

● উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে কোনো নদী যখন অন্য কোনও নদীতে এসে মেশে, তখন তাকে ঐ নদীটার **উপনদী (Tributary)** বলে। যমুনা, গোমতী,ঘর্ঘরা, কোশী, গণ্ডক প্রভৃতি নদীগুলো গঙ্গার উপনদী।

● আবার মূলনদী থেকে যে সমস্ত নদী শাখার মতো বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে মেশে তাদেরকে **শাখানদী (Distributary)** বলে। ভাগীরথী-হুগলী হলো গঙ্গার প্রধান শাখানদী।

ভেবে দেখো তো!

আগের দুটো পরীক্ষায় জলের প্রবাহ লক্ষ করে যা কিছু বুঝতে পারলে তার সঙ্গে এই 'উপনদী' ও 'শাখানদীর' ধারণার কি কোনো মিল পেলে?

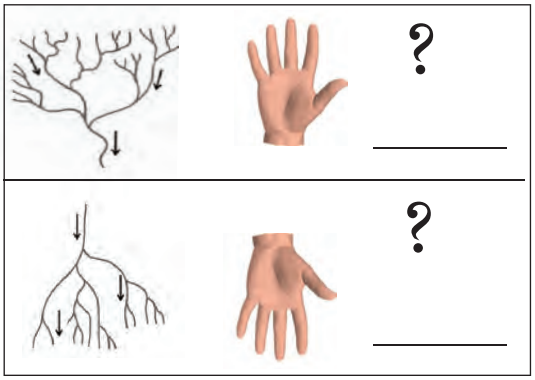

পিকলুর ডায়েরি

● 'উৎস' থেকে 'মোহনা' পর্যন্ত যে খাতের মধ্যে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তাকে **নদীর উপত্যকা (River Valley)** বলে।

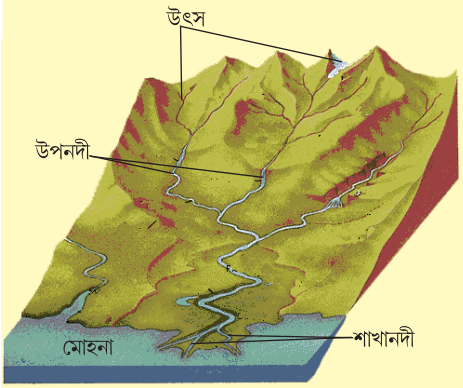

● নদী তার উপনদী ও শাখানদী সহ উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগকে **নদী অববাহিকা(River Basin)** বলে। আমাজন নদীর অববাহিকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী অববাহিকা।

● পাশাপাশি প্রবাহিত দুটো নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে **দোয়াব** বলা হয়। (পার্শি শব্দ 'দোয়াব' 'দো'= দুই 'আব'=জল/নদী) ভারতের গঙ্গা ও যমুনা নদীর 'দোয়াব' অংশে আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহর অবস্থিত।

● যে নদী কোনো দেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে সেই দেশের মধ্যেই কোনো হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে মেশে তাকে **অন্তর্বাহিনী নদী (Inland River)** বলে। ভারতের লুনি, রাশিয়ার আমুদরিয়া অন্তর্বাহিনী নদী।

● যে নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে **আন্তর্জাতিক নদী (International River)** বলে। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, ইউরোপের রাইন, দানিয়ুব আন্তর্জাতিক নদী।

- পুজোর ছুটিতে গঙ্গোত্রী বেড়াতে গিয়ে পুতুল যখন জানতে পারলো যে ডায়মন্ড হারবারে তার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্তশিষ্ট গঙ্গা নদীটাই এখানে ভীষণ জোরে শব্দ করে ছুটে চলেছে, তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।
- আরও একটা ব্যাপার সে লক্ষ করল, গঙ্গোত্রীতে নদীটা খুব বেশি চওড়া নয়, বেশি জলও নেই, অথচ প্রবল তার গতি! কিন্তু তার বাড়ির কাছে এই নদীটাই কত চওড়া আর প্রচুর জলে ভর্তি!

বলতে পারো, একই নদী দুটো জায়গায় দু রকম কেন?

পুতুলের মতো তোমরাও নিশ্চয়ই তোমার বাড়ির আশপাশের কোনো নদীকে লক্ষ করেছো?

- **ভেবে দেখেছো নদীর 'এত' জল আসছে কোথা থেকে?** (বরফ-গলা জল/বৃষ্টির জল/ ঝরনার জল/ হ্রদের জল/না কি অন্য কোনো নদী থেকে?)

'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার-হাঁটু জল থাকে---'

- তোমার দেখা কোনো নদীর সঙ্গে যদি এই কবিতার মিল খুঁজে পাও, তাহলে সেই নদীটার নাম লেখো ————————————।

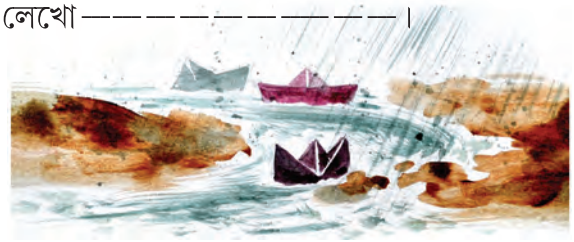

জানো কী?

- সাধারণত যে সব নদী উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্টি হয়, তার জলের উৎস প্রায়শই বরফ-গলা জল। এই নদীগুলোতে সারা বছর জল থাকে বলে এদের **নিত্যবহ নদী (Perennial river)** বলে। মানচিত্রে এই নদীগুলো নীলরঙের সাহায্যে দেখানো হয়।

- মালভূমি বা অন্য কোনো কম উঁচু জায়গায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলোর জলের উৎস সাধারণত বৃষ্টির জল। একারণে শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া, সারাবছর এই নদীগুলোতে জল প্রায় থাকে না, তাই এদেরকে **অনিত্যবহ নদী (Non-perennial river)** বলে। মানচিত্রে এই রকম নদীকে কালো রঙে দেখানো হয়।

বর্ষাকালে অথবা কোনো বৃষ্টির দিনে রাস্তার জমা জলে, নর্দমার জলে, খালে, বিলে কাগজের নৌকা ভাসাতে বেশ ভালো লাগে, কেমন তর্ তর্ করে স্রোতে ভেসে চলে! — লক্ষ করেছো কি জলটা কেমন ঘোলা। জলের স্রোতে মাটি, বালি, ছোটো নুড়ি পাথর, আর্বজনা সবই জলের মধ্যে এসে পড়ে, আবার কিছু দূরে যেতে না যেতেই নৌকাটাও কোথাও আটকে যায়!

নদী কী কী কাজ করে

● নদীও মূলত বয়ে যাওয়া জলধারা। নদীও তার জলস্রোতের ধাক্কায় মাটি, বালি, ছোটো বড়ো নুড়ি এমনকি বড়ো বড়ো পাথর সবই চূর্ণ করে এগিয়ে চলে, এটাই নদীর **ক্ষয়কাজ (Erosion)**।

● এইসব নুড়ি, কাঁকড়, বালি, পলি সবই নদীর স্রোতের সঙ্গে উঁচু থেকে নীচু অঞ্চলের দিকে বয়ে চলে, এটাই নদীর **বহনকাজ (Transportation)**।

● আবার কোথাও স্রোত কমে গেলে এই সব পদার্থগুলো নদীর পাশে বা নদীর মধ্যে জমা হতে থাকে। এটাই নদীর **সঞ্চয়কাজ (Deposition)**।

নদীর এই তিনপ্রকার কাজ নির্ভর করে নদীর শক্তির ওপর। নদীতে জলের পরিমাণ, গতিবেগ, ভূমির ঢাল প্রভৃতি থেকে নদী শক্তি পায়। নদীর শক্তি বেড়ে গেলে, নদী বেশি করে ক্ষয় আর বহন কাজ করে, আবার নদীর শক্তি কমে গেলে নদী বেশি সঞ্চয় করে।

নদীর শক্তির সঙ্গে নদীর কাজের কী সম্পর্ক, বুঝতে পারলে?

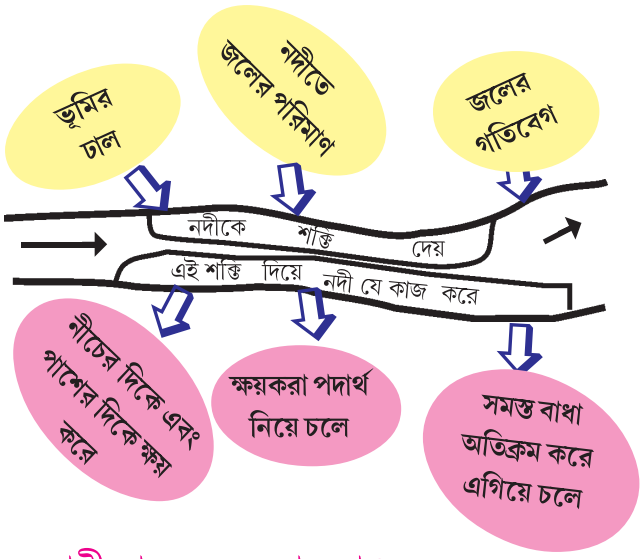

ভেবে দেখেছো?

স্কুল থেকে ফেরার পর কেমন ক্লান্ত লাগে। যে স্কুলব্যাগটা স্কুলে যাওয়ার সময় অনায়াসে বয়ে নিয়ে গেছ, সারাদিন পর ফিরে সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেখে দিতে ইচ্ছে করে। আবার খাওয়া দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আর ক্লান্তি থাকে না। তুমিও শক্তি পেয়ে যাও!

পরীক্ষা করে বলো তো?

জল কোথায় তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়?

- সমতল জায়গায় ☐
- ঢালু জায়গায় ☐

ঢালু জায়গায় জল কখন তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যায়?

- জলের পরিমাণ বাড়লে ☐
- জলের পরিমাণ কমলে ☐

মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর কী মিল!!

ভেবে দেখেছ, মানুষের মতো নদীরও একটা জন্ম অর্থাৎ 'উৎস' আছে। আর উৎসের কাছাকাছি প্রচণ্ড শক্তিতে নদী দুরন্ত গতিতে বয়ে চলে, নদী তখন ঠিক তোমাদেরই মতো ছট্‌ফটে, চঞ্চল!

⇨ এটাই নদীর উচ্চপ্রবাহ।

পরবর্তী পর্যায়ে নদী যখন পাহাড় থেকে মালভূমি বা সমভূমিতে এসে পড়ে, তখন ভূমির ঢাল কম হয়ে যাওয়ায় নদীর শক্তিও কমে যায়, আর নদীর গতিও কম হতে শুরু করে। নদী তখন একজন পরিণত মানুষের মতোই (যেমন বাড়িতে তোমার মা-বাবা) ধীর এবং শান্ত।

⇨ এটাই নদীর মধ্যপ্রবাহ।

শেষ পর্যায়ে নদী যখন সাগর বা অন্য কোনো জলভাগের কাছাকাছি চলে আসে, তখন ভূমির ঢাল একেবারেই থাকে না, নদীর শক্তিও প্রায় ফুরিয়ে যায়, নদী তখন বৃদ্ধ মানুষের মতোই (যেমন তোমার ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা বা দাদু, দিদা), কাজ করার ক্ষমতা প্রায় থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত 'মোহনায়' গিয়ে তার প্রবাহ শেষ হয়ে যায়।

⇨ এটাই নদীর নিম্নপ্রবাহ।

ভেবে নিয়ে লিখে ফেলো

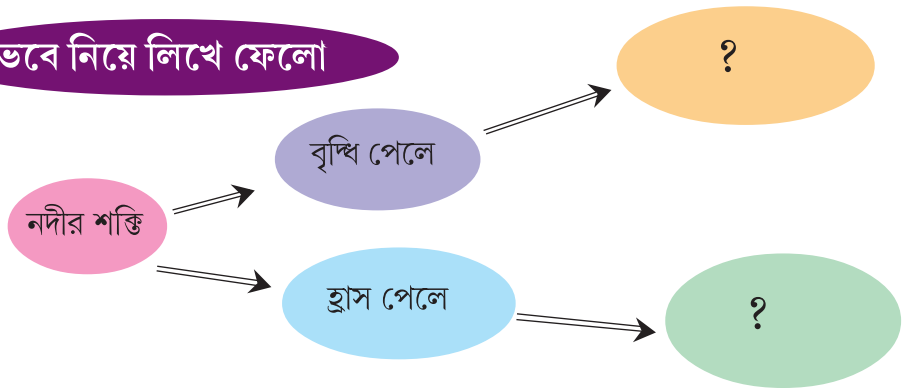

- উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত প্রবাহপথে নদী তার শক্তি অনুযায়ী ক্ষয়, ক্ষয়জাত পদার্থ বহন এবং বাহিত পদার্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠকে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন করে চলেছে।

নদীর উচ্চপ্রবাহ

উৎস থেকে সমতলভূমিতে নামার আগে পর্যন্ত নদীর **উচ্চপ্রবাহ**।

ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার উচ্চপ্রবাহ গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত।

নদী, জলচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৃষ্টির জল নদীর মধ্য দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে আবার নদীতে ফিরে আসে।

- পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ঢাল এবং ভূমির উঁচু নীচুভাব (বন্ধুরতা) খুব বেশি হওয়ার জন্য নদীর শক্তিও বেশি থাকে। **ফলে এই প্রবাহে নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়।**
- এই প্রবল জলস্রোতের আঘাতে নদীর গতিপথের বড়ো বড়ো পাথর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জলের সঙ্গে ভেসে বা গড়িয়ে এগিয়ে চলে।

- নদীর স্রোতের সঙ্গে এই ছোটোবড়ো পাথরগুলো নদীর তলায় ধাক্কা দিয়ে ক্ষয় করে, ফলে নদীর উপত্যকা গভীর হতে থাকে। উচ্চ প্রবাহে নদীর উপনদীর সংখ্যা কম থাকে, ফলে নদী-উপত্যকা খুব চওড়াও হয় না। এই 'সরু' এবং 'গভীর' নদী উপত্যকা ইংরেজি 'I' বা 'V' অক্ষরের মতো দেখতে হয়। একে **গিরিখাত (Gorge)** বলে। বৃষ্টিহীন পার্বত্য অঞ্চলে, শুষ্ক অঞ্চলে এরকম সুগভীর গিরিখাতকে **ক্যানিয়ন (Canyon)** বলা হয়।

গিরিখাত (ক্যানিয়ন)

- নদীর গতিপথে শক্ত আর নরম পাথর অনুভূমিক ভাবে থাকলে, নদী নরম পাথরকে বেশি ক্ষয় করে, ফলে শক্ত এবং নরম পাথরের মধ্যে ধাপের সৃষ্টি হয় আর নদী শক্ত পাথরের ওপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে, **জলপ্রপাত (Waterfall)** সৃষ্টি করে। পশ্চিমঘাট পর্বতের 'যোগ' জলপ্রপাত (২৬০ মিটার)।

জলপ্রপাত

নদীর মধ্যপ্রবাহ

পার্বত্য অঞ্চলের পর, মালভূমি বা সমভূমি অঞ্চলে নদীর **মধ্যপ্রবাহ**।

হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের মিঠিপুর পর্যন্ত গঙ্গানদীর মধ্যপ্রবাহ।

- মধ্যপ্রবাহে ভূমির ঢাল কম থাকায় নদীর গতি এবং শক্তি দুটোই কমে যায়। **নদী প্রধানত বহন এবং সঞ্চয় কাজ করে।**

- এসময় নদী নীচের দিকে ক্ষয় করা প্রায় বন্ধ করে দেয়, ফলে উপত্যকার গভীরতাও কমে যায়। প্রচুর উপনদীর মাধ্যমে নদীতে জলের পরিমাণ বাড়ে এবং নদী দু-পাশের দিকে বেশি ক্ষয় করে, ফলে নদী উপত্যকা চওড়া হতে থাকে।

- ভূমির ঢাল কমে যাওয়া এবং জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে নদী খুবই আঁকাবাঁকা পথে **(মিয়েন্ডার)** প্রবাহিত হয়। নদীর বহনক্ষমতাও কমে যায়। বয়ে আনা পলি বালি, নুড়ি, কাঁকর নদীর মধ্যে বা দু-ধারে সঞ্চিত হলে, জল প্রবাহের পথ আটকে যায়। নদীতে চড়া পড়ে। কখনও **নদী- দ্বীপ** তৈরি হয়।

- পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ৬০ শতাংশ স্থানে কম বেশি নদীর কাজ দেখা যায়।
- সব নদীতে 'উচ্চ', 'মধ্য' এবং 'নিম্ন' এই তিনটি প্রবাহ দেখা যায় না।

মিয়েন্ডার

নদী-দ্বীপ

- নদীর বাঁকের একদিকে (খাড়াপাড়ের দিকে) জলস্রোত বেশি থাকে, তার উল্টোদিকে (ঢালুপাড়ে) সঞ্চয় বেশি হয় ফলে নদী একপাড় ভাঙে, অন্য পাড় গড়ে। নদীর বাঁকের পরিমাণ বাড়লে, বা নদীতে জল বাড়লে কখনো কখনো নদী বাঁকের একটা অংশ মূল নদী থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই আলাদা হওয়া অংশটা ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে হয় বলে একে **অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ** বলে।

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথ

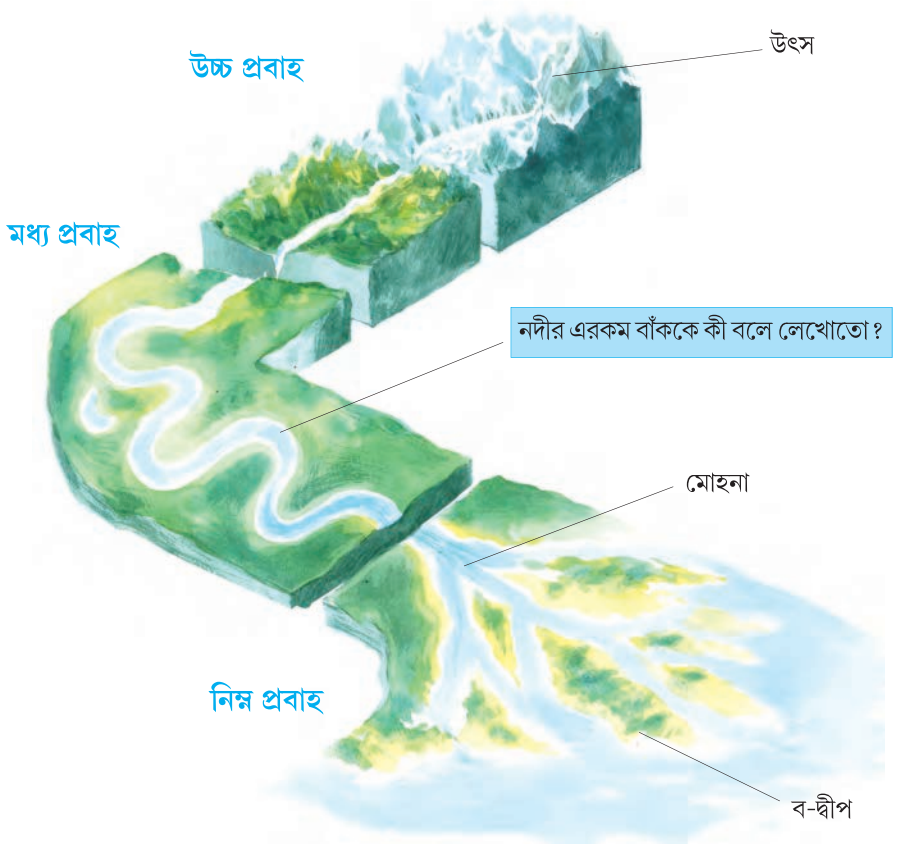

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর প্রধান কাজ

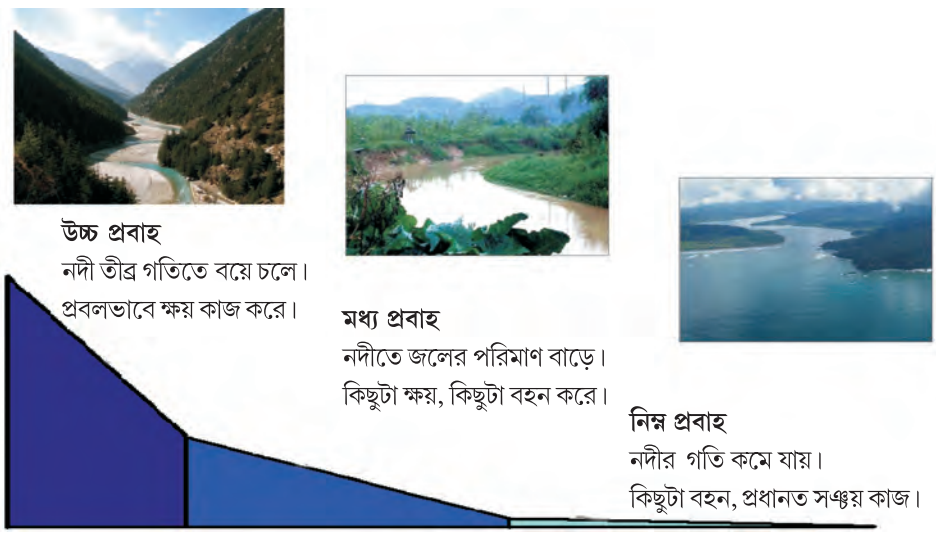

নদীর নিম্ন প্রবাহ

● উচ্চ এবং মধ্যপ্রবাহের পর অত্যন্ত মৃদু ভূমিঢালের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে নদী মোহনা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটাই **নিম্নপ্রবাহ**। মুর্শিদাবাদের মিঠিপুরের পর থেকে বঙ্গোপসাগরে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা নদীর নিম্নপ্রবাহ।

এই সময় নদীর গতি এবং শক্তি এতই কমে যায় যে ক্ষয়কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, সামান্য বহন কাজ হলেও, **নদীর মূল কাজ হয় সঞ্চয়।**

প্লাবনভূমি

এই প্রবাহে উপনদী প্রায় থাকেই না। বরং কিছু শাখানদী সৃষ্টি হয়। নদীর মধ্যে পলি, বালি, কাঁকর জমে নদী অগভীর হয়ে যায়। ফলে বর্ষার অতিরিক্ত জল দুকূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। নদীর দুধারের বিস্তীর্ণ জমিতে বন্যার সময় পলি সঞ্চিত হয়ে উর্বর **প্লাবনভূমি (Flood plain)** সৃষ্টি করে।

➤➤ নদীর মোহনার কাছে নদীর বহন করে আনা পলি, বালি, কাঁকর জমা হয়ে চড়া সৃষ্টি হয়। নদীর স্রোত তখন ভাগ হয়ে চড়ার দু-দিক দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে প্রায় ত্রিভুজের মতো (বাংলার মাত্রাহীন '△' / গ্রিক অক্ষর 'ডেল্টা 'র মতো) **ব-দ্বীপ (Delta)** সৃষ্টি হয়।

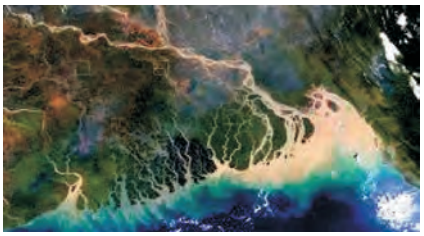

ব-দ্বীপ

● সব নদীই কিন্তু মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করতে পারে না। নদীতে পলির পরিমাণ কম থাকলে, নদী প্রবল বেগে সমুদ্রে পড়লে, অথবা মোহনায় প্রবল সমুদ্র স্রোত থাকলে ব-দ্বীপ গড়ে উঠতে পারে না। একারণেই পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজনের কোনো ব-দ্বীপ নেই।

খাঁড়ি কী?

● কিছু নদীর মোহনায় জোয়ারের সময় নোনা জল নদীতে ঢুকে ফানেলের মতো আকৃতির চওড়া মোহনা বা খাঁড়ি তৈরি করে।

● পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের প্রচুর নদীতে এরকম খাঁড়ি দেখা যায়।

ঠিক ঠিক লেখো দেখি

উচ্চগতি	⇨	মধ্যগতি	⇨	নিম্নগতি
↓		↓		↓
ক্ষয়কাজ বেশি		? / কম		ক্ষয়কাজ হয় না
↓		↓		↓
? / কম		বহনকাজ বেশি		? / বেশি হয়

ধরতে পারলে মজা

⇨ তোমার বাড়ির কাছাকাছি কোনো নদীকে লক্ষ করে নদীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধরণা করো।

⇨ নদীটার নাম——

⇨ নদীতে জল (বেশি / কম)

⇨ নদীর গতিবেগ (বেশি / কম)

⇨ ভূমির ঢাল (বেশি / কম)

⇨ **অতএব নদীটার কোন প্রবাহ? (উচ্চ/মধ্য/নিম্ন)।**

নদী ও মানুষ

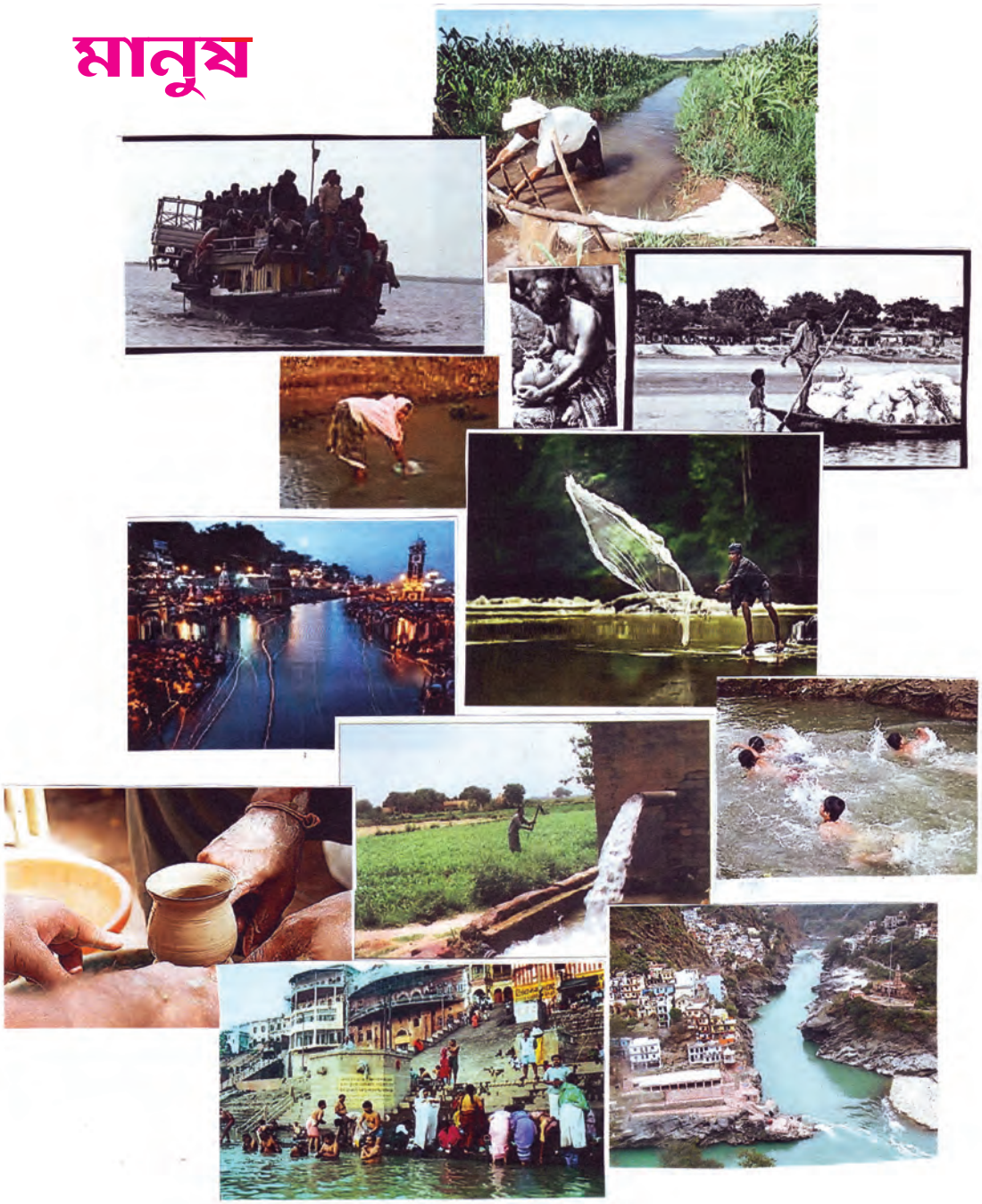

আমাদের জীবনে নদীর প্রভাব কতখানি

সেদিন ভূগোল ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় যখন মধুকে নদীর উপকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন , মধু শুধু একটা কথাই বলেছিল— **'নদীটা আমাদের খেতে দেয়, আমাদের বাঁচিয়ে রাখে!'**

নদীমাতৃক এই দেশের নদীগুলো আসলে আমাদেরই **জীবনকথা**। নদী শুধু আমাদের ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্বের বিষয় নয়। রোজকার জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে আছে নদী।

➤ মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কোনো না কোনো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। (সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর ধারে সুমেরীয় সভ্যতা)। বর্তমানকালে আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের যে সুবিশাল সমভূমি, চিনের ইয়াং সিকিয়াং, হোয়াংহো নদীর উপত্যকা সবই পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল অঞ্চল। অতএব নদী শুধু সভ্যতার জন্মই দেয় না, তাকে লালন-ও করে।

ছবির কোলাজ থেকে সব লিখে ফেলা যায়

নদীর প্রভাব	আমাদের জীবনে
নদীর জল	
পলিমাটি, সমভূমি	কৃষিকাজ, নগরায়ন, সভ্যতার উন্নতি
প্লাবনভূমি, কৃষিজমি	
জলসেচ	
জলবিদ্যুৎ	
নদীর মাছ, প্রাণী	
পরিবহণ	
ভ্রমণ, বিনোদন	
পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য	নদীর জল, পলিমাটি , উদ্ভিদ-প্রাণীর বিকাশ, মাটির নীচের জলের ভারসাম্য রক্ষা।

ভেবে দেখেছো?

- মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক এত নিবিড় হলেও, মানুষের কিছু কিছু কাজ নদীর স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করেছে।

➤ কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, শিল্পায়ন, নগরায়ন, ইতাদি নানাভাবে নদীকে প্রভাবিত করছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নদীর পাড়ে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করলে সাময়িক সুফল পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত তা আরও ভয়াবহ বন্যারই কারণ হয়ে উঠছে! একদিকে কৃষিজমি থেকে ধুয়ে আসা পলিতে নদী ক্রমশ ভরাট হচ্ছে। অন্য দিকে সেচের জলের জোগান দিতে নদী ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে।

➤ শহর, শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য জল নদীতে অবাধে মিশে গিয়ে নদীর জল ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

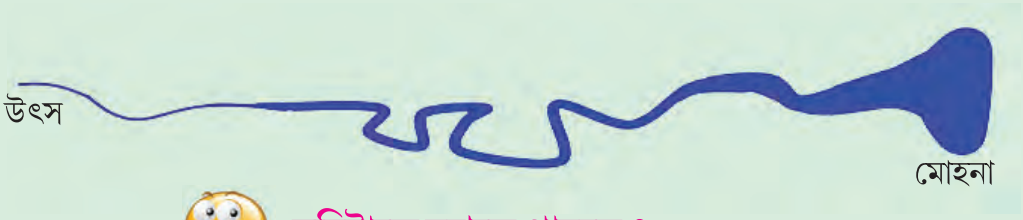

ছবিটাকে বুঝতে পারলে ?

শব্দগুলো খুঁজে বের করো

তি	মো	হ	না	দ্ব	ব	হ	ন
প্র	নি	খী	জ	য	ষ	প্র	লু
শা	ত্য	জ	ল	প্র	পা	ত	খা
খা	ব	হ	বি	জ্ঞ	মা	লী	ত
ন	হ	ক্যা	ভা	শি	স	বি	ষ্ণ
দী	প্ত	নি	জি	ক্ত	ঞ্চ	ঘ	ক
জী	ক্ষ	য়	কা	জ	য়	জি	নি
প্লা	ব	ন	ভূ	মি	জ্র	খা	মি

সূত্র :

- নদী যেখানে মেশে।
- যে নদীতে সারা বছর জল থাকে।
- মূল নদী থেকে যে নদী বেরিয়ে যায়।
- যে ভূখণ্ড বৃষ্টির জলকে বিভিন্ন দিকে ভাগ করে দেয়।
- শুষ্ক অঞ্চলের সুগভীর গিরিখাতকে যা বলে।
- নদীর জল ওপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে-----সৃষ্টি করে।
- নদীর দু-ধারে বন্যার সময় পলি সঞ্চিত হয়ে----সৃষ্টি হয়।
- উচ্চপ্রবাহে, মধ্যপ্রবাহে এবং নিম্ন প্রবাহে নদী যে প্রধান কাজগুলো করে।